স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৫ম বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা ❑ অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে ও গোপাল সরকার

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু
বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ব্যাপম কেলেঙ্কারি ও ডিম্যাট কেলেঙ্কারি—ডাক্তার তৈরির চোরাকারবার

মধ্যপ্রদেশের প্রাইভেট কলেজে ডাক্তারি আসন বিক্রির দুর্নীতিচক্রে কোটি কোটি টাকার ব্যাবসা করেছে, আর তার তদন্ত শুরু হতেই সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ চিকিৎসক আর ছোটোখাটো সব দালালরা খুন হয়ে যাচ্ছেন, যাতে রাঘববোয়ালদের গায়ে হাত না পড়ে। চোরাপথে ঘুষ দিয়ে মানুষ মারা পথ বেয়ে যে ছাত্র ডাক্তারি পড়তে ঢুকবে, তার কাছে কী মনুষ্যত্ব আশা করব আমরা? লিখছেন **ডা. জিৎ সরকার।** (৪)

অযথা ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করাবেন না

গাঁটে ব্যথা হলে ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ তাতে লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি। লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী।** (৮)

এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি

সন্তান ধারণে সক্ষম সমস্ত নারীর এই একটা মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি যেটা সময়ে ধরা না পড়লে প্রাণসংশয় সম্ভব। কখন এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি সন্দেহ করবেন, আর সেক্ষেত্রে করবেনই বা কী? লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জী।** (৩১)

টিকা কীভাবে কাজ করে

টিকা দিয়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ অনেক রোগ থেকে বাঁচে, কিন্তু কেমন করে কাজ করে সেই টিকা? জানাচ্ছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস।** (৪১)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

ব্যাপম কেলেঙ্কারি ও ডিম্যাট কেলেঙ্কারি—
ডাক্তার তৈরির চোরাকারবার: ডা. জিৎ সরকার ৪

অযথা ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করাবেন না
ডা. গৌতম মিস্ত্রী ৮

অবসাদ একটি ঘুণপোকা: ডা. অনীক চক্রবর্তী ১৫

টুকরো খবর

সরকারি হাসপাতালে ওষুধ সংরক্ষণ ১৮
আমেরিকার সিডিসি কতটা নিরপেক্ষ ১৯
মৃত্যুর পর অঙ্গদান ২১
টেবিলের ওপর রাখার মতো মস্তিষ্ক কলা ২২

হরেকরকম

নারীর চরম যৌন তৃপ্তি ২৪
সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক ২৪
আবার কঙ্কাল কাণ্ড ২৫
ঘুমিয়ে হাঁটা বা স্লিপ ওয়াকিং ২৫
কাঠগড়ায় কেবল নব্য প্রজন্মের ডাক্তার: ডা. অনীক চক্রবর্তী ২৬

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন ২৯-৩৭

এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি: ডা. কাঞ্চন মুখার্জি ৩১
জরায়ু নেমে যাওয়া: ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৩৪
অসুরক্ষিত গর্ভপাত: শ্রীমতি মুখোপাধ্যায় ৩৬

এন জি ও-দের সঙ্গে: ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৩৮
টিকা কীভাবে কাজ করে: ডা. স্বপন বিশ্বাস ৪১
মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার
কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন, ২০০২ (দ্বিতীয় অংশ) ৪৫
অনুবাদ: দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়
বয়স্ক ব্যক্তিদের শরীরের ব্যথার সমস্যা—
কেন হয় ও কী তার প্রতিকার: ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই ৪৮
ইরানের ফাঁসিপ্রাপ্ত তরুণীর দেহদান: একই বিষয়ে এই
দেশের জটিলতা: সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী ৫০

জানা ওষুধ অজানা কথা

অ্যাম্লোডিপিন ৫২

চিঠি

ডা. শ্যামল ব্যানার্জী: একজন অনুচ্চারিত
চিকিৎসকের নাম ৫৩

পুস্তক পর্যালোচনা

যখন পৃথিবী বিপন্ন (এক পরিবেশ বিষয়ক সংকলন):
ডা. জয়ন্ত দাস ৫৫

শব্দছক: প্রস্তুতি—রুচিরা মজুমদার ৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল	কলকাতার অন্যত্র
পাতিরাম	অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
বুকমার্ক	এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
পিপলস বুক সোসাইটি	লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭,
বই-চিত্র	কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
মনীষা গ্রন্থালয়	বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট	দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৮৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৮৯২৬২৮৬২৬৪)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

***'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'*-এর গ্রাহক হোন।**

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সম্পাদকীয়

ব্যাপম কেলেঙ্কারি ও চিকিৎসকের মানবিকতা

পশ্চিমবঙ্গে যেমন মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ডাক্তারি ছাত্র ভর্তির পরীক্ষা নেবার জন্য 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড' আছে মধ্যপ্রদেশে তেমন আছে 'মধ্যপ্রদেশ ব্যাবসায়িক পরীক্ষা মণ্ডল', সংক্ষেপে 'ব্যাপম'। বেশ কয়েকমাস ব্যাপম সংবাদ-শিরোনামে। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো নানাভাবে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি এমন ছাত্রদের বিশাল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ডাক্তারিতে ভর্তি করে নিত। এ-খেলা বহু পুরোনো। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকার তদন্ত শুরু করে ২০০৯ সালে, আর ২০১৩ সালে দুর্নীতির ব্যাপকতার খানিক ইঙ্গিত মেলে। তদন্ত যত এগিয়েছে ততই বেরিয়ে এসেছে আরও বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রী, আমলা, পর্ষদ সদস্য, দালাল, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নাম। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-কে তদন্তভার দেন।

ব্যাপম দুর্নীতির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত অন্তত ৩২ জন মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু (অর্থাৎ খুন) হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীরা তদন্তের সবথেকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে খুন হয়েছেন। এদের অনেকে চুনোপুঁটি অপরাধী হলেও, জবলপুরের মেডিক্যাল কলেজের ডিন ডা. ডি কে সাকালি, ও তাঁর পরবর্তী ডিন ডা. অরুণ শর্মা—এঁদের অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখিয়ে দেয় ব্যাপম-এর পেছনে সবথেকে ক্ষমতাশালীরাই কলকাঠি নাড়ছে। তবে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল, কালো টাকা খরচ করে, অন্যদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে, যেসব ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে ঢুকছেন, তাঁরাই কালকের ডাক্তার। আর ব্যাপম মধ্যপ্রদেশে ঘটেছে বলে আমাদের নিরাপদ বোধ করার কোনো কারণ নেই, কেননা মেডিক্যাল শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও টাকার বিনিময়ে ডাক্তারি আসন হল ব্যাপম কেলেঙ্কারি ও হত্যালীলার আদি কারণ—সেটা পশ্চিমবঙ্গেও চালু হয়েছে। মানুষকে বাঁচানো ডাক্তারের কাজ, সাধারণ মানুষ এমনটাই বিশ্বাস করতে চান। তাই টাকা দিয়ে ডাক্তারি পড়ার আসন কিনবার পথে বাধা মানুষদের মেরে ফেলা, আর সেইভাবে ডাক্তারিতে 'চান্স' পেয়ে ডাক্তারি পেশাকে লগ্নি টাকা তোলার ব্যাবসা হিসেবে কাজে লাগানো—এটা আমাদের ভয় পাইয়ে দেয়।

ডাক্তাররা মানবিক নন, তাঁরা পয়সার জন্য অকারণে অপারেশন করেন, কমিশন খেয়ে রোগীর অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লেখেন, পরীক্ষানিরীক্ষা করান—ইত্যাদি অজস্র অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে ডাক্তারি পড়তে গেলে যথেষ্ট ধনী হতে হবে, কয়েক কোটি কালো টাকা দিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হবে (খুন-জখমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম), তাহলে সেখান থেকে পাশ করার পর ধনীর দুলাল ডাক্তাররা জনদরদি ও স্বার্থচিন্তামুক্ত হবেন, এমনটা আশা করা যায় কি? অথচ সরকার ও রাজনৈতিক নেতারা একদিকে ডাক্তারদের মানবিক হবার উপদেশ দিচ্ছেন, অন্যদিকে গত কয়েক বছরে সরকার মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করার ভার ক্রমশ প্রাইভেট হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। প্রাইভেট কলেজগুলো ক্যাপিটেশন ফি ইত্যাদি নানা নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে সাদা টাকা ও কালো টাকা আদায় করে ডাক্তারি আসনগুলো বিক্রি করছে। আর আমাদের সরকার ও আইনি ব্যবস্থা ক্রমে সেটার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। ১৯৯১ সালে কর্নাটকের একটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিলেন—

''ভারতে শিক্ষা কখনোই ব্যাবসার পণ্য হিসাবে পরিগণিত হয়নি। ক্যাপিটেশন ফি . . . অযৌক্তিক, অন্যায় এবং অনৈতিক। যেকোনো মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত মেধা এবং একমাত্র মেধা-ই।''

১৪ বছরে 'পরিবর্তন' সম্পূর্ণ! ২০০৫ সালে পিএ ইমানদার বনাম মহারাষ্ট্র সরকারের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বললেন ''সরকার বেসরকারি কলেজের কোনো সিট দাবি করতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ফি নিজের ইচ্ছেমতো ঠিক করতে পারে।''

ব্যাপম কেলেঙ্কারি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। মূল অসুখ অনেক গভীরে। একজন অভিভাবক যখন তাঁর পুত্র/কন্যার জন্য যেকোনো মূল্যে, সমস্ত রকম দুর্নীতির সাহায্য নিয়ে, মেডিক্যাল কলেজে আসন কিনতে চান, আর সেই ডাক্তারি ছাত্রটিও যখন সেই প্রক্রিয়ার অংশীদার হয়, তার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ডাক্তারি, মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা নিয়ে চিকিৎসা—এসব ভাবাও সম্ভব নয়। দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে এরকম অমানবিক করে তুলছে যারা, জনগণ এখনও পর্যন্ত তাদের কাছে কোনো কৈফিয়ত দাবি করছে না। সুতরাং ব্যাপম ট্র্যাডিশন চলতে থাকবে। মেডিক্যাল শিক্ষা প্রাইভেট-হাতে তুলে দেবার প্রবল সমর্থক রাজনীতিবিদ আর সংবাদপত্রগুলোর ডাক্তারের অমানবিকতা নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের ট্র্যাডিশনও সমানে চলবে।

ব্যাপম কেলেঙ্কারি ও ডিম্যাট কেলেঙ্কারি—ডাক্তার তৈরির চোরাকারবার

ডা. জিৎ সরকার

ব্যাপম কেলেঙ্কারি ও ডিম্যাট কেলেঙ্কারি নিয়ে কিছু কথা

মধ্যপ্রদেশ ব্যাবসায়িক পরীক্ষা পর্ষদ, হিন্দিতে সংক্ষেপে যাকে বলা হয় ''ব্যাপম'' (ব্যাবসায়িক পরীক্ষা মণ্ডল) [''Vyapam'' (Vyavsayik Pariksha Mandal)], হল রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত একটা স্বশাসিত পর্ষদ যার উপর রাজ্যের বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার দায়িত্ব বর্তায়। নামটা 'ব্যাবসায়িক' হলেও, বাংলায় যাকে ব্যাবসা বোঝায় এটা সে অর্থে কোনো ব্যাবসার ব্যাপার নয়। রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি চাকরির জন্য কর্মী বাছাই এই পর্ষদের নিয়ন্ত্রণেই করা হয়। অনেক অযোগ্য পরীক্ষার্থী বেআইনিভাবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় পর্ষদের সদস্য, নেতা-মন্ত্রী ও দালালদের ঘুষ দিয়ে। এই সামগ্রিক দুর্নীতির চক্রটার কার্যকলাপ নিয়েই 'ব্যাপম কেলেঙ্কারি'। যদিও ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষাকেই কেন্দ্র করেই মূলত এই দুর্নীতি ঘটেছে বলে প্রচারিত হয়েছে; 'এমডি এন্ট্রান্স', 'খাদ্য পরীক্ষক বাছাই পরীক্ষা', 'দুধ সংগঠন পরীক্ষা', 'সুবেদার-সাব ইন্সপেক্টর-প্লাটুন কমান্ডার বাছাই পরীক্ষা,' 'পুলিসকর্মী নিয়োগ পরীক্ষা' ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য এই কেলেঙ্কারি দায়ী।

৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেশ কিছু গণ্ডগোল দেখতে পাওয়া যায়। ২০০০ সালে তা নিয়ে প্রথম মামলা করা হয়। ২০০৯ সালের ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় একসঙ্গে অনেক নালিশ জমা পড়ায় রাজ্য সরকার একটা কমিটি গঠন করে সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করে। ২০১১ সালে কমিটি তার রিপোর্ট দেয়। তারই ফলে ১০ জনের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১৩ সালে যখন ইন্দোর পুলিস ২০০৯ সালের পরীক্ষার ২০ জন নকল পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে একমাত্র তখনই দুর্নীতির ব্যাপকতার আন্দাজ পাওয়া যায়। সেই ২০ জনকে অনুসন্ধান করে জগদীশ সাগর নামক এক ব্যক্তির নাম ধরা পড়ে, যাকে এই সংগঠিত চক্রের মূল সংগঠক বলে গ্রেফতার করা হয়। রাজ্য সরকার একটা 'বিশেষ তদন্তকারী টিম' (Special Task Force, সংক্ষেপে STF) গঠন করেন ও তার মাধ্যমেই যাবতীয় তদন্তের কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে তদন্ত যত এগিয়েছে ততই বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রী, আমলা, পর্ষদ-সদস্য, দালাল, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নাম।

২০১৫ সালের জুন মাসের মধ্যে ২০০০-এর বেশি মানুষ এই দুর্নীতির কারণে গ্রেফতার হয়। এর মধ্যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত শর্মাসহ আরও অনেক মন্ত্রীও ছিলেন। অবশেষে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এই তদন্ত প্রক্রিয়াটা সিবিআই-এর তত্ত্বাবধানে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়।

পরীক্ষায় দুর্নীতির কলাকৌশল

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীর জায়গায় অন্য একজন 'অভিজ্ঞ মানুষ' বসিয়ে তাকে দিয়ে উত্তরপত্র ভর্তি করানো হয়। ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত এই অভিজ্ঞ মানুষ হল কোনো ডাক্তার বা ডাক্তারি পড়ছে এমনই কেউ। এই কাজের জন্য সেই ব্যক্তিকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয় যাতে পরীক্ষার সময় 'অ্যাডমিট কার্ড' দেখে তা মেলানো না যায়। ফলত নকল পরীক্ষার্থী কে তা বোঝবার আর উপায় থাকে না। এই ধরনের কাজ পরীক্ষা পর্ষদের সদস্যদের মদত ছাড়া হতেই পারে না। আর 'অভিজ্ঞ' পরীক্ষার্থী জোগাড় করতে যে ডাক্তার ও ডাক্তারি-পড়া ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বেশ গভীর যোগাযোগ লাগে সেটাও বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। অনেক সময় আবার একজন 'অভিজ্ঞ' পরীক্ষার্থীকে কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর পাশেই বসত যাতে অভিজ্ঞ-র উত্তরপত্র দেখে দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী সহজেই সব উত্তর টুকতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে আবার পরীক্ষার্থী ফাঁকা উত্তরপত্রই জমা দিত, আর পরে সেই কেন্দ্রের পরীক্ষকরাই সেই ফাঁকা উত্তরপত্রটিতে ঠিকঠাক উত্তর লিখে দিত।

এইসব কলাকৌশল থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একটা অত্যন্ত সংগঠিত চক্র ছাড়া এই কাজ কখনোই সফল হতে পারে না। পাশাপাশি এটাও বোঝা জলের মতোই সোজা যে একজন বিত্তশালী ব্যক্তির পক্ষে অর্থ ব্যয় করে যেকোনো ডিগ্রি বা চাকরি কেনা সম্ভব। আর

একজন বিত্তশালী ব্যক্তির পক্ষে অর্থ ব্যয় করে যেকোনো ডিগ্রি বা চাকরি কেনা সম্ভব। আর মেধাবী গরিব পরীক্ষার্থীরা কোনোদিনই এইভাবে ডিগ্রি বা চাকরি পাওয়ার সুযোগ পাবে না।

মেধাবী গরিব পরীক্ষার্থীরা কোনোদিনই এইভাবে ডিগ্রি বা চাকরি পাওয়ার সুযোগ পাবে না। কোন ডিগ্রি, বাজারে তার মূল্য কত, সেই অনুযায়ী পরীক্ষায় এই 'বিশেষ সুযোগ'-এর দাম বাড়ে কমে। যেমন ডাক্তারিতে এমডি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই ডিগ্রির দাম কোন বিষয়ে এমডি করবে তার উপর নির্ভর করে। ডিগ্রির বাজারমূল্য অনুযায়ী ডিগ্রি কেনার দাম বেশি দিতে হয়।

উপরের পদ্ধতি বাদেও দুর্নীতির একটা আরও জটিল ও সূক্ষ্ম পদ্ধতি আছে। সরকারি আইন অনুসারে, কোনো বেসরকারি কলেজ স্থাপন করতে গেলে সেই কলেজের কয়েকটি আসন বরাদ্দ রাখতে হয় সরকারি পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য। অনেকক্ষেত্রে আবার কিছু আসন সংরক্ষিত করা থাকে গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। বাকি আসনগুলো বেসরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেয়। বেসরকারি কলেজগুলো মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলে মুনাফার জন্য, তাই সেই কলেজের নিজস্ব পরীক্ষাতে কোটি কোটি টাকার খেলা আর সীমাহীন দুর্নীতি হয়েই থাকে। উপরন্তু সরকারি পরীক্ষার মাধ্যমে আসন ভর্তি নিয়েও দুর্নীতি হয়। এরকম একটা নিয়ম আছে যে কেউ যদি সরকারি পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে তারপরে আসনটা ছেড়ে দেয়, তখন সেই ফাঁকা আসনটা কলেজের নিজস্ব পরীক্ষার মাধ্যমেই ভর্তি হবে। আর এই পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই চলে দুর্নীতি। আর এই প্রকারের দুর্নীতি অনেক সূক্ষ্ম ও 'আইনি'।

কলেজের পর্ষদ আর দালালচক্র এখানে মিলিতভাবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের সরকারি পরীক্ষায় বসায়। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের কোনো বেসরকারি কলেজে ভর্তি করিয়ে পরে সেই আসনটা তাকে দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়। ফলত সরকারি পরীক্ষার জন্য যে আসনগুলো বরাদ্দ ছিল তা চলে যায় কলেজের নিজের অধিকারে। সেখানে সে তার ইচ্ছেমতো মোটা টাকার অঙ্কের বদলে প্রার্থী ভর্তি করে। অনেকক্ষেত্রে আবার আসন নিলামও হয়।

কিন্তু অন্য সব চাকরির পরীক্ষাতেও কি আর দুর্নীতি হয় না, নাকি ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির ব্যাপারটি আমাদের দেশে এমনিতে দুর্নীতিমুক্ত? না, তা তো নয়। তবে 'ব্যাপম' নিয়ে এত হইচই-এর কারণ কী? কারণ হল দু-টো। এক, সরকারি নিয়ন্ত্রকদের ব্যাক্তিগত মদতপুষ্ট দুর্নীতি, যা পরিমাণে বিশাল ও বাধাহীনভাবে ঘটে গেছে বছরের পর বছর—এমনটা এর আগে জনসমক্ষে আসেনি। দুই, ব্যাপম নিয়ে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও সিবিআই—এদের তদন্তে জানা গেছে যে ব্যাপম দুর্নীতির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত অন্তত ৩২ জন মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, এবং তদন্ত চলাকালীন যেভাবে নানা তদন্তাধীন সম্ভাব্য অপরাধীর মৃত্যু হয়েছে, তাতে বোঝা যায় রাঘববোয়ালদের বাঁচানোর জন্য চুনোপুঁটিদের মেরে ফেলা হচ্ছে। মেডিক্যালে ভর্তি হতে চাওয়া ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে তাদের 'ব্যবস্থা' করে দিত যারা, সেইসব চুনোপুঁটি দালালরাই বেশিরভাগ মারা পড়েছে। মৃতদের কেউ কেউ আবার ডাক্তার বা ডাক্তারি ছাত্র, যারা পয়সার বিনিময়ে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে দিত। অধিকাংশই মরেছে রাস্তায় 'দুর্ঘটনা'-য় (এবং দোষী গাড়ি ধরা পড়েনি), কেউ মরেছে আত্মহত্যা করে (তাদের নিকটাত্মীয়রা সবাই কিন্তু 'আত্মহত্যা'-র তত্ত্ব মেনে নেননি), কারোর বা মৃতদেহ হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল ব্রিজের তলায়।

অবশ্য মৃতেরা সবাই ঠিক 'চুনোপুঁটি' নন। ২০১৪ সালের ৪ জুলাই জবলপুরের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মেডিক্যাল কলেজের ডিন ডা. ডি কে সাকালি মারা গেলেন—বলা হল তিনি নিজের বাড়ির পেছনের বাগানে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মরার আগে তিনি একমাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসেছিলেন, কেননা ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে যুক্ত কিছু ছাত্রকে কলেজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, আর তারা নানাভাবে ডা. সাকালি-র ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। ২০১৫ সালের ৫ জুলাই অরুণ শর্মাকে দিল্লির একটা হোটেলে মৃত পাওয়া গেল। অরুণ শর্মা ডা. সাকালি-র জায়গায় ডিন হয়েছিলেন, আর 'বিশেষ তদন্তকারী টিম'-কে তদন্তের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ব্যাপম-এর পেছনকার মাথাগুলো যে সত্যিই চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী সেটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

ডিম্যাট: ব্যাপম-এর চেয়ে বড়ো কেলেঙ্কারি— সিবিআই দায় নেবে না

সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-কে বলেছিলেন 'ডিম্যাট কেলেঙ্কারি' নিয়ে তদন্ত করতে, কিন্তু সিবিআই জানিয়েছে নানা কারণে সেটা সম্ভব নয়। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সিবিআই বলেছে, তাদের অত লোকবল নেই। *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*-র খবরে দেখেছি, সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দাখিল করে বলেছে,

> ডিম্যাট কেলেঙ্কারি নিয়ে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের কথা অনুযায়ী, এই কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছে ২০০৯ সাল থেকে, এবং প্রতি বছর কয়েক হাজার ছাত্র প্রাইভেট ডেন্টাল ও মেডিক্যাল কলেজে 'ম্যানেজমেন্ট কোটা'-য় ভর্তি হয়েছে। তাই এর (ডিম্যাট কেলেঙ্কারির) গভীরতা ও ব্যাপ্তি ব্যাপম কেলেঙ্কারির চাইতে বহুগুণ বেশি।

'ডিম্যাট' কথাটা হল মধ্যপ্রদেশের 'ডেন্টাল অ্যান্ড মেডিক্যাল অ্যাডমিশন টেস্ট' (Madhya Pradesh Dental and Medical Admission Test-DMAT)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ব্যাপম-এর পরে ডিম্যাট-ও সুপ্রিম কোর্টের তদন্তের আওতায় আসে, আর সিবিআই-এর ডাক পড়ে। কিন্তু সিবিআই বলে,

> এটা বিনীতভাবে জানানো হচ্ছে যে ব্যাপমসহ যেসব কেস নিয়ে সিবিআই-কে কাজ করতে হচ্ছে, সেগুলো করাই তার ক্ষমতার তুলনায় খুব শক্ত, অসম্ভবই বলা যায়, কেননা যথাযথ পরিকাঠামো ও বিশেষ করে উপযুক্ত লোকবল সিবিআই-এর নেই। ব্যাপম ছাড়াও ১০০০-এরও বেশি চিট ফান্ড সংক্রান্ত কেস সিবিআই-এর হাতে ঝুলছে। ইন্সপেক্টর থেকে অতিরিক্ত এসপি পদমর্যাদার কর্মীরা সিবিআই কেসগুলো অনুসন্ধান করতে পারেন, আর এরকম পদের সংখ্যা মাত্র ১২৬৪, তার মধ্যে আবার ৩৪৮টা পদ খালি আছে।

মধ্যপ্রদেশে ১৫টা প্রাইভেট ডেন্টাল কলেজ আর ৬টা প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ আছে, আর এদের হাতে ২৮০০ টা আসন আছে। সেগুলো ভর্তি করার জন্য 'অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রাইভেট মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কলেজেস' প্রতি বছর ডিম্যাট পরীক্ষা নেয়। এর মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ আসন সরকারি কোটা, শতকরা ৪৩ ভাগ আসন ম্যানেজমেন্ট কোটা (অর্থাৎ কলেজকে অসম্ভব মোটা টাকা দিয়ে ভর্তি), ও বাকি শতকরা ১৫ ভাগ আসন এনআরআই কোটা (অর্থাৎ অনাবাসী ভারতীয়দের পাঠানো ছাত্ররা কলেজকে বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়ে ভর্তি)—এইভাবে পূরণ হয়।

ডিম্যাট কেলেঙ্কারি নিয়ে আবেদনকারীদের বক্তব্য, ম্যানেজমেন্ট কোটা ও এনআরআই কোটা মিলিয়ে মোট শতকরা ৫৮ ভাগ আসনই বিরাট দুর্নীতির মধ্য দিয়ে ভর্তি হয়। আর বাকি সরকারি কোটার শতকরা ৪২ ভাগ আসন নিয়েও 'স্কোরার'-এর সাহায্যে পুকুরচুরি হয়। কীভাবে সেটা হয় সেটা আবেদনকারীরা ব্যাখ্যা করেছেন।

পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীরা ফাঁকা উত্তরপত্র জমা দেন, আর ডিম্যাট কর্মকর্তারা সেগুলো ভর্তি করে দেন। আর সরকারি কোটার আসন হস্তগত করার জন্য এমবিবিএস ছাত্ররা, যারা ওই প্রবেশিকা পরীক্ষা সম্পর্কে খুব ভালো জানে ও অভিজ্ঞ (স্কোরার), তারাই পয়সার বিনিময়ে ওই পরীক্ষায় বসে, তারপর রেজাল্ট বেরোলে আসনটা আটকে রাখে। ভর্তি হবার শেষ দিনের শেষ মুহূর্তে তারা আসন ছেড়ে দেয়, তখন সেই আসনগুলো ওই প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে ম্যানেজমেন্ট কোটায় বিক্রি করার আইনি অধিকার পায়। শেষ মুহূর্ত বলে পরীক্ষায় ফল তুলনায় ভালো করেছে এমন কেউ জানতেও পারে না, আগে থেকে ঠিক করা কাউকে সবচেয়ে কোনো মোটা অঙ্কের টাকাতে সেই আসন বেচে দেওয়া হয়।

পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, ব্যাপম আর ডিম্যাট—এ দুয়ের 'মোডাস অপারেন্ডি' একই। ব্যাপম নিয়ে তদন্তের জেরে ইতিমধ্যেই ৩২ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছে, আর সিবিআই-ও ওপরমহলের চাপ আর মৃতের মিছিলের মাঝখানে পড়ে নাজেহাল। তার চাইতেও ডিম্যাট বড়ো মাপের কেলেঙ্কারি— ফলে আরও উঁচুতলার রাঘববোয়ালেরা এখানে থাকবেন, আর মৃতের মিছিল আরও বেশি লম্বা হবে, এটা নিশ্চিত—তাই কি সিবিআই সকাতরে অব্যাহতি চাইছে?

আমরা অবশ্য এইসব কেলেঙ্কারি আর তার খবর পড়ে পড়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এও এক শিল্প। মানুষকে তথ্যসমৃদ্ধ অথচ নিষ্ক্রিয় বানানোর ব্যাপারটা একদিনে হয়নি, আর বিনা চেষ্টাতে ঘটে যাওয়া কোনো ব্যাপারও এটা নয়।

তথ্যসূত্র: http://timesofindia.indiatimes.com/india/MP-DMAT-scam-bigger-than-Vyapam-CBI-tells-Supreme-Court/articleshow/48461145.cms

ডাক্তার তৈরির চোরাকারবার

ব্যাপম কেলেঙ্কারি' বলে একটা দুর্নীতির খবর বেশ কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যমের জালিকায় চরে বেড়াচ্ছিল।

কেলেঙ্কারিটির ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশ। গোটা দেশ জুড়েই তাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ব্যাপক জনকোলাহল। দুর্নীতির খবরের রমরমার বাজারে এই 'টাটকা' খবরটা আপন নিয়মেই 'ব্রেকিং নিউজ' হয়ে ওঠে। নেতা-মন্ত্রী, ডাক্তার, আইনজীবী, সাধারণ মানুষ সকলেই এই খবরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনায় মেতে ওঠে। এ প্রসঙ্গে খুঁটিনাটি প্রবন্ধের প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে। ২০১৫ সালের জুন মাসের মধ্যে ২০০০-এর বেশি মানুষ এই দুর্নীতির কারণে গ্রেফতার হয়। এর মধ্যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত শর্মাসহ আরও অনেক মন্ত্রীও ছিলেন। অবশেষে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এই তদন্ত প্রক্রিয়াটা সি বি আই-এর তত্ত্বাবধানে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেন।

অন্য সব চাকরির পরীক্ষাতেও দুর্নীতি হয়, ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির ব্যাপারটিও আমাদের দেশে দুর্নীতিমুক্ত নয়। ব্যাপম নিয়ে এত হইচই-এর কারণ হল দু-টো। এক, বাধাহীনভাবে সরকারি আমলা মন্ত্রী নেতা মাফিয়া শিক্ষাবিদ শিক্ষাব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত মদতে বিশাল পরিমাণে দুর্নীতি ঘটে গেছে বছরের পর বছর—এবং জনসমক্ষে সেটা এসে গেছে, এমন ঘটেনি। দুই, ব্যাপম নিয়ে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও সিবিআই—এদের তদন্তে জানা গেছে যে ব্যাপমের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত অন্তত ৩২ জন মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন নানা তদন্তাধীন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মনে হচ্ছে বড়ো বড়ো চাঁইরা এখনও অধরা, মরছে কেবল ছোটো ছোটো চুনোপুঁটি। ব্যাপম কেলেঙ্কারি মধ্যপ্রদেশে ঘটলেও এই ধরনের দুর্নীতি যে অন্যান্য রাজ্যেও বিস্তৃত, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শিক্ষা ও তা থেকে অর্জিত ডিগ্রিকে যদি আমরা বাজারের আলু-পটল হিসাবে দেখতে থাকি, যা টাকা দিয়ে কেনা যায়, তাহলে উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্নীতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি কেন?

১৯৯০-এর দশক থেকে 'অর্থনৈতিক সংকট'-এর কারণ দেখিয়ে সরকার সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারি খরচ কমাতে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক পরিষেবাকেও বাজারের হাতে তুলে দেয়। ফলত ব্যাঙের ছাতার মতো একের পর এক বেসরকারি কলেজ ও নার্সিং হোম গড়ে উঠতে থাকে। আর এই সকল প্রতিষ্ঠানে পরিষেবা পাওয়ার একমাত্র উপায় টাকা, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ডাক্তারি পড়তে সুযোগ পাবারও একমাত্র মাপকাঠি টাকাই হবার কথা। কিন্তু সেটা সরাসরি হলে মুশকিল, লোকে বলবে অযোগ্য ছেলেমেয়েদের ডাক্তার বানালে তাদের হাতে বেঘোরে মরতে হবে। তাই সেখানে ঘুরিয়ে নাক দেখানোর বন্দোবস্ত করা হল।

জনকল্যাণমূলক পরিষেবাগুলোর বেসরকারিকরণ নিয়ে সরকার, বিচারব্যবস্থা সকলের সুর ধীরে ধীরে পালটাতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারত সরকার দ্বারা গঠিত কোঠারি কমিশন বলেছিল, ''শিক্ষার ফি-কে আয়ের উৎস হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। এটি একটি জনবিরোধী রূপ। সমাজের দরিদ্রশ্রেণির ওপর বোঝাটা বেশি পড়ে।''

আর তারপরে ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী শিক্ষা কমিশন প্রস্তাব দিল যে উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব সরকার ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলুক। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ, ফি-বৃদ্ধির প্রস্তাব দিল কমিশন।

১৯৯১ সালে কর্নাটকের একটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের ক্যাপিটেশন ফি বাবদ অতিরিক্ত ৪ লক্ষ টাকা নেওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মামলার রায়ে বলা হয়েছিল:

> ভারতীয় সভ্যতায় শিক্ষাকে সমাজের পবিত্র অধিকার বলেই মানা হয়। ভারতে শিক্ষা কখনোই ব্যাবসার পণ্য হিসাবে পরিগণিত হয়নি। ক্যাপিটেশন ফি পরিষ্কার শ্রেণিবিভাজনকে সামনে নিয়ে আসে। বেশি মেধার এক গরিব ছাত্র টাকা না থাকায় শিক্ষার সুযোগ পায় না, যেখানে ধনী ছাত্র টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে পারে। এইরকম ব্যবহার অযৌক্তিক, অন্যায় এবং অনৈতিক। যেকোনো মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত মেধা এবং একমাত্র মেধাই।

আর ২০০৫ সালে পিএ ইমানদার বনাম মহারাষ্ট্র সরকারের মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে—''সরকার বেসরকারি কলেজের কোনো সিট দাবি করতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের ফি নিজের ইচ্ছেমতো ঠিক করতে পারে।'' ১৫% এনআরআই সিট রাখার অনুমতিও দেওয়া হয়। ২০০২ সালে টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন বনাম কর্নাটক রাজ্য সরকার মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে—''এটা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত যে পেশাগত শিক্ষা পেতে চাইলে তার দাম দিতেই হবে। বেসরকারি শিক্ষা হল একুশ শতকে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে গতিশীল ও দ্রুত বর্ধনশীল।''

নয়া-উদারনীতির হাত ধরে তাই শিক্ষা হয়ে দাঁড়াল একটি ক্রয়যোগ্য পণ্য। সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করল এই ধারণা। আপামর মানুষের পক্ষে শিক্ষার বেসরকারিকরণকে মেনে নিতে যেটুকু সমস্যা, সেটাকে দূর করার

''যেকোনো মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত মেধা এবং একমাত্র মেধাই।''—সুপ্রীমকোর্ট

পবিত্র দায়িত্ব হাতে তুলে নিল বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্র, নানা রাজনৈতিক দল, নানারঙ্গের শিক্ষাবিদ, এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা মন্ত্রক, আমলা, মন্ত্রী। এমনকী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যৌক্তিক প্রতিষ্ঠান বিচারব্যবস্থাও শিক্ষাকে ক্রয়যোগ্য বলে ঘোষণা করল। ক্রমশ শিক্ষা হয়ে উঠল এক এমন পণ্য যা কিনতে পারলে ক্রেতার নিজের বিক্রয়মূল্য বাজারে বেড়ে যায়। আর স্পষ্ট করে বললে নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থাতে শিক্ষা রইল না, রইল ডিগ্রি, যা এমন এক পণ্য যা ক্রেতার সামাজিক শ্রমমূল্য বাড়িয়ে দেয়। ডিগ্রি মানে ভালো চাকরি, ভালো মাইনে। একটা দামি গাড়ি কিনে রাস্তা দিয়ে অন্যর চাইতে আগে আর আরামে যাবার সুযোগ যদি পয়সা দিয়ে কেনা যায়, তাহলে ডিগ্রি কিনেই বা কেন আগে সাফল্য ও আরাম কেনা যাবে না? তাই ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট—যেসব ডিগ্রি চট করে ছাত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়, সে ডিগ্রি কিনতে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নামক দোকানে লম্বা লাইন লাগবেই, আর আসনের চেয়ে পরীক্ষার্থী বেশি থাকলে তাহলে

ডিগ্রি নিলাম হবে, সেটাই স্বাভাবিক। সমাজের নৈতিক অবস্থানও (মহামান্য আদালতের ঘোষণা) যদি এই ঘটনাবলির সঙ্গে তালে তাল মিলিয়েই চলে তাহলে আসন নিয়ে কেলেঙ্কারি না হয়ে আর কী হবে!! যার টাকা আছে সে কেনই-বা দুর্নীতি করবে না!!!

ও ডাক্তার!!!

দুর্নীতির সম্ভাবনা যেরকম পরীক্ষা পর্যদে বিদ্যমান, ঠিক তেমনি তা সমাজের অন্যান্য আঙ্গিকেও সমানভাবে বিদ্যমান। যেকোনো সামাজিক জীবিকার ক্ষেত্রেই দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকে। ''ব্যাপম কেলেঙ্কারি'' বাড়তি আশঙ্কা হয়তো এটাই যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া ডাক্তারদের ঠিক কী ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠবে। সামাজিক দায়িত্ববোধ যদি বাদ দিয়েও দেখি, নৈতিকতার দায় এরা কেনই-বা নেবে? যে ভর্তির সময় ২৫-৫০ লক্ষ টাকা ফি দেয় তার পক্ষে কী করে সম্ভব ১০ টাকায় রোগী দেখা? সে কি পারবে যুক্তিসঙ্গতভাবে চিকিৎসা করতে, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা না লিখতে, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কাট-মানি না খেতে?

ডাক্তারি করার স্বল্প অভিজ্ঞতা দিয়ে যা বুঝেছি তা হল এই যে ডাক্তারের মুখ্য ভূমিকা হল মানুষের ব্যথা কমানো ও অকালমৃত্যু প্রতিরোধ করা। রোগীকে কেবল বর্তমান মুহূর্তের অবস্থানে না দেখে তাই অতীত আর ভবিষ্যতের সঙ্গে জুড়ে দেখতে হয় তাকে। কষ্টের মূল অনুসন্ধান ডাক্তারকে নিরন্তর চালিয়ে যেতে হয়। আর তা করতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন পড়ে এক গভীর জীবনবোধের, এক মানবিক মূল্যবোধের। শুধু ডিগ্রি দিয়ে তা কখনোই হতে পারে না। মুহূর্তে বাঁচার আর মুহূর্তে বাঁচানোর 'টেকনিক্যাল দক্ষতা' কিনে নেবার মানসিকতা দিয়ে তা হতে পারে না। সেই মূল্যবোধ গড়ে ওঠার রাস্তায় ''ব্যাপম কেলেঙ্কারি'' যদি দুর্নীতির

''ব্যাপম কেলেঙ্কারি'' যদি দুর্নীতির স্কেলের শেষ প্রান্তে অবস্থান করে, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো কিন্তু সেই স্কেলের মাঝামাঝি আছে।

স্কেলের শেষ প্রান্তে অবস্থান করে, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো কিন্তু সেই স্কেলের মাঝামাঝি আছে। আর সর্বত্রই টিকি নাড়ছে সেই চরম ও পরম সত্তা—টাকা। টাকাই নির্দেশ করছে সমস্ত মূল্যবোধকে। ডাক্তারের তো রোগীর অনেক কাছে যেতে পারার কথা ছিল, তার বন্ধু, সহমর্মী হয়ে ওঠার কথা ছিল—তাকে আটকে দিচ্ছে টাকা, পণ্য-সম্পর্ক। রোগীর চোখে ডাক্তার তাই অচেনা, অজানা, ভিন গ্রহের জীব হয়ে থেকে যায়। আর ডাক্তার? এক টেকনিক্যাল রোবটের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে মানুষ যতটুকু সুখী হতে পারে, তার সুখের গণ্ডি ততটুকুতেই ঠেকে থাকে। এও এক জীবন-বঞ্চনা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জিৎ সরকার, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

Advt.

Wth Best Compliments from

A
Well Wisher

অযথা ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করাবেন না

গাঁটে ব্যথা হলে ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ তাতে লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি—বিশদে লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**।

অনেকের মতো আমিও গাড়ি চালাতে পারি; মানে পছন্দ করি আর না করি, গাড়ি আমাকে চালাতে হয়। গাড়ি যেমন গড়গড়িয়ে চলে, তেমন মাঝে মাঝেই মাঝপথে থেমেও যায়। পেট্রোল খালি হবার আগেও থেমে যায়। এমন ক্ষেত্রে কী করণীয় সেটা সঠিক না জানা থাকায় আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে মেকানিক মজুত না থাকায় ঠকাস করে গাড়ির বনেট খুলে তাজমহল দেখার চেয়েও বেশি বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি। কোনো ম্যাজিক হবে না জেনেও এটা ওটা ঠুকে দেখি। গাড়ির তলায়ও লম্বা লম্বা পাইপ আছে, সেখানেও গণ্ডগোল থাকতে পারে, কিন্তু গাড়ির তলায় তলিয়ে দেখার ভরসা পাই না। আমার শখের মেকানিকগিরি গাড়ির বনেটের বাক্সে সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য আমি একা নই। আর গাড়ির চাইতে শরীরের ওপর শখের মেকানিকগিরি ফলানোর ইচ্ছা আরও প্রবল। তাই আমরা মাথা ঘুরলে রক্ত চাপ মেপে মাথা ঘামাই, নাড়ির গতির খোঁজ করি না। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে লিভারের টনিক গিলি। হার্টের ব্যথা হলে অম্বলের ওষুধ খাই। কান পেতে গুজব শুনে, টেলিভীষণ আর কাগুজে বিজ্ঞাপন দেখে, রাস্তার মোড়ের পেটের রোগের দৈব ওষুধ বিক্রেতার প্রচারের বাণী শুনে আমরা মানব শরীরের নাড়ি-নক্ষত্রের জ্ঞান পিপাসা মেটাই। শিক্ষিত হয়েও আপন সুরক্ষার ন্যূনতম তথ্যের জন্য অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই, যেমন করে যৌনশিক্ষার জন্য হলদে মলাটের বটতলার বই সম্বল করি।

এই হাতড়ে বেড়ানোর হাতুড়েপনার ফলে কোনো এক অজানা কারণে, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া রক্তের যেসব পরীক্ষাগুলি সবচেয়ে বেশি করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল ইউরিক অ্যাসিড। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রায় সবারই বিভিন্ন অস্থিসন্ধি বা গাঁটে (joints) প্রদাহজনিত ব্যথা হতে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর কারণ অস্থিসন্ধির ক্ষয়জনিত রোগ (degenerative joint disease) বা সাধারণ বাত (অস্টিওআর্থ্রাইটিস)। অথচ সব ধরনের গাঁটের ব্যথায় অন্যান্য ডাক্তারি পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের পরীক্ষা করে নেওয়াই চল হয়ে গেছে। মুশকিল হয় যদি অস্টিওআর্থাইটিস রোগীদের কাকতালীয়ভাবে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও বেড়ে যায়।

অথবা গল্পটা অন্যরকম হতে পারে। হয়তো আপনার ব্লাড প্রেসারের রোগ (উচ্চ রক্তচাপ)। বিচক্ষণ ডাক্তার নিয়মমাফিক রক্তের সুগার আর কোলেস্টেরল মাপতে ব্যবস্থাপত্র লিখেছেন। পাড়ার ওষুধের দোকানের হারু বাড়ি থেকে রক্ত নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেয়। মুচকি হেসে সে বলল, এক সঙ্গে কয়েকটা টাকা দিয়ে ইউরিক অ্যাসিডটাও পরীক্ষা করিয়ে নিন। ওই একবারে সংগ্রহ করা রক্ত থেকেই হয়ে যাবে। আপনিও হারুর বিচক্ষণতায় মুগ্ধ। ইউরিক অ্যাসিডের পরীক্ষা হয়ে গেল। এ ছাড়াও কর্পোরেট হারুরা আছেন। এখন মাস্টার হেল্‌থ চেক আপের রমরমা। কয়েক ফোঁটা রক্ত থেকে সুদৃশ্য কাগজে ছেপে দিচ্ছে গাদা গাদা পরীক্ষার ফল। আপনার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত চুলচেরা বিচার করে বলে দিচ্ছে রক্তের চিনি, নুন, লোহা, আর্সেনিক, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি হরেক কিসিমের পরিমাণ; হেপাটাইটিসের ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’ আর ‘ডি’-এর লুকিয়ে থাকা ভাইরাসের আস্তানা; থাইরয়েড, লিভার, প্যানক্রিয়াসের কর্মদক্ষতার মাপজোক।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ইউরিক অ্যাসিডের পরীক্ষা করার পরামর্শ নেবার দরকার হয় না, অথচ চিকিৎসকের পরামর্শ সত্ত্বেও অনেক দরকারি ডাক্তারি পরীক্ষা উপেক্ষিত থেকে যায়। চিকিৎসকের পরামর্শে উল্লেখ করা নানা রকমের পরীক্ষার মধ্য থেকে দু-একটা বাদ থেকে যায়, কারণ অনেক ব্যস্ত রোগী পরীক্ষাগারে যাবার সময় প্রেসক্রিপশন সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে যান। স্মৃতির উপর ভরসা করে পরীক্ষা করার সময় প্রয়োজনীয় ‘রক্তের ইউরিয়া’ পরীক্ষা বাদ পড়ে যায়, ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা হয়ে যায়। ইউরিক অ্যাসিডের ফল স্বাভাবিক হলেও তবু রক্ষে, কিন্তু সমস্যা হয় যদি সেটা অস্বাভাবিক হয়।

গাঁটে ব্যথা ও ইউরিক অ্যাসিড

রক্তে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড কচিৎ কদাচিৎ কিছু কিছু রোগ সৃষ্টি করে। জনমানসে গাঁটে ব্যথার রোগের একটা ধারণা আছে। অনেকেরই জানা নেই যে, সব রকম গাঁটের ব্যথার মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্যের জন্য যে বিশেষ ধরনের রোগ হয় সেটি সংখ্যায় অতি নগণ্য এবং তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ার ফলে যে গাঁটের ব্যথার রোগ হয় তার নাম ‘‘গাউট (gout)’’। গাউটের ব্যথার বৈশিষ্ট্য এমনই যে সেই রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষারও প্রয়োজন হয় না। আর যদি কোনো গাঁটের ব্যথার বৈশিষ্ট্য গাউটের মতো না হয়, তবে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি হলেও সেটা গাউট না হবার কথা। তার অন্য কারণ খুঁজতে হবে, ইউরিক অ্যাসিড কমানোর ওষুধ খেলে সেই ব্যথা সারবে না। শুধু গাঁটে ব্যথা নয়, অনেকে পায়ের পাতা ফুলে গেলেও ইউরিক অ্যাসিডকে ভিলেন ঠাউরে বসেন। সেটা ভুল।

কোন ধরনের গাঁটের ব্যথায় ইউরিক অ্যাসিডের ভূমিকা আছে বলে সন্দেহ করবেন? মনে রাখবেন, মাঝ বয়সের পরে যত ধরনের গাঁটের ব্যথা হয়, তার মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডের জন্য গাঁটের ব্যথা বা গাউট সংখ্যায় খুব কম। কম হলেও একে চিনতে ভুল হবার নয়, কারণ এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অন্য সব ধরনের গাঁটের ব্যথার থেকে আলাদা। প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে গাউটের ব্যথার বৈশিষ্ট্যগুলো এই রকম—গাউটের ব্যথা সাধারণত মাঝরাতে শুরু হয়। যদি পায়ের বুড়ো আঙুলের গাঁটে হঠাৎ মাঝরাতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় আর বুড়ো আঙুলের সঙ্গে পায়ের পাতার অস্থিসন্ধিটা (গাঁট) লাল হয়ে ফুলে ওঠে তবে এটা নিশ্চিত যে এই ব্যথার কারণ গাউট বা রক্তে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড। অস্টিওআর্থ্রাইটিসের

ব্যথায় তীব্রতা কম, কিন্তু নিরাময় হয় না, থেকে যায়। গাউটের ব্যথা ওষুধ খেলে বা কখনো কখনো এমনিতেই সেরে যায়। কিছুদিন পরে ব্যথার লেশমাত্র থাকে না। এমন অবস্থায় কখনো কখনো রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা স্বাভাবিকও থাকতে পারে, তাতে ইউরিক অ্যাসিডকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তখন প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিড কতটা বেরোচ্ছে সেটা মাপতে হবে ও গাঁটের বিশেষ স্ক্যান করতে হবে।

ইউরিক অ্যাসিডের রোগসৃষ্টি করার ক্ষমতাগুলিকে প্রধানত দুই প্রকারে ভাগ করা হয়। সরাসরি ইউরিক অ্যাসিডের কেলাস (মনোসোডিয়াম ইউরেট, monosodium urate, MSU) ভুল জায়গায় জমে যাওয়ার জন্য অস্থিসন্ধি, চামড়া ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অস্থিসন্ধিতে ইউরিক অ্যাসিডের কেলাস জমে যেমন গাউট নামে বিশেষ ধরনের গাঁটের ব্যথা হয়, তেমন গাঁটের উপরে চামড়ার ইউরিক অ্যাসিডের কেলাস জমে ''টোফাস'' (Tophus, বহুবচনে Tophi) তৈরি হয়। কিডনিতে (বৃক্ক) ইউরিক অ্যাসিডের কেলাস জমে ছোটো ছোটো পাথর তৈরি হতে পারে, অথবা কখনো কখনো বিশেষ এক ধরনের ''ইউরেট নেফ্রোপ্যাথি'' নামে কিডনির রক্ত ছাঁকার অংশের রোগ হতে পারে। ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্যের জন্য আরও এক প্রকারের রোগভোগের বোঝা বাড়ে, যেগুলোর সঙ্গে সরাসরি ইউরিক অ্যাসিডের কেলাসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। উচ্চ রক্তচাপ, দীর্ঘমেয়াদি অনিরাময়যোগ্য কিডনির অসুখ (chronic kidney disease), হৃদ্‌রোগ, মেটাবলিক সিন্ড্রোম (মেটাবলিক সিন্ড্রোম *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* গত সংখ্যায় আলোচিত) রোগসমূহের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদিভাবে রক্তে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। ওষুধের দ্বারা রক্তের ইউরিক অ্যাসিড কমিয়ে এসব থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি না সেটার সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণ নেই।

সুখে থেকে ভূতের কিল

যখন গাউট সন্দেহ করা যেতে পারে এমন গাঁটে ব্যথা নেই, বা চামড়ায় টোকাস-এর মতো কিছু নেই, বা কিডনিতে ইউরিক অ্যাসিড-ঘটিত অসুখ সন্দেহ করার কারণ নেই, তখন রক্ত পরীক্ষায় মাত্রাতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড পাওয়া গেলে যে আপাত-নিরীহ অবস্থা নির্ণীত হয় তাকে পরিভাষায় অ্যাসিম্পটোম্যাটিক হাইপার-ইউরেসিমিয়া (asymptomatic hyper-uricaemia) বলে। এর পর থেকে আমাদের আলোচনা মূলত এই বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখব। এই ক্ষেত্রে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, কিন্তু শরীরের কোথায়ও মনোসোডিয়াম ইউরেটের কেলাস জমে গিয়ে বিশেষ গাঁটের ব্যথা (গাউট) টোফাস, কিডনিতে ইউরিক অ্যাসিডের পাথর বা ইউরেট নেফ্রোপ্যাথির অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড তাহলে 'অস্বাভাবিক' বেশি কেন?

রক্তে বিভিন্ন পদার্থের স্বাভাবিক মাত্রা নিরূপণের প্রচলিত একটা পদ্ধতি আছে। বহুসংখ্যক আপাত-সুস্থ বিভিন্ন বয়সের স্বাভাবিক পুরুষ ও মহিলাদের রক্তের ওই বিশেষ পদার্থটির মাত্রা নিরুপণ করে অধিকসংখ্যক মানুষের ওই পদার্থের মাত্রার যে সীমা (নিম্নসীমা ও ঊর্ধ্বসীমা) পাওয়া যায় সেটাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। ইউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির একটা সমস্যা আছে। দেখা গেছে একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা রক্তের অন্যান্য উপাদানের মতো স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত থাকে না (bell shaped curve নয়)। ফলে এই পদ্ধতিতে নির্ণীত ইউরিক অ্যাসিডের স্বাভাবিক মাত্রা অকাজের। পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে, ইউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যর (physiochemical property) উপর ভিত্তি করে এর স্বাভাবিক মাত্রা নিরূপণের পদ্ধতি কার্যকরি। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এক সময় রক্ত ইউরিক অ্যাসিডকে আর দ্রবীভুত করে রাখতে পারে না, অস্থিসন্ধিতে, চামড়ার নীচে আর কিডনিতে মনোসোডিয়াম ইউরেট কেলাস হিসাবে জমতে শুরু করে। এই মাত্রাকে ইউরিক অ্যাসিডের জন্য স্বাভাবিকের উচ্চ সীমা বলা হয়। স্বয়ংক্রিয় এনজাইম প্রক্রিয়ায় (automatic enzymatic process) নির্ণীত হলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের উচ্চ সীমা প্রতি ডেসিলিটারে ৭ মিলিগ্রাম হবে। কলোরিমেট্রিক পদ্ধতিতে নির্ণীত হলে এই মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ১ মিলিগ্রাম কম হবে। আমরা এর পরের আলোচনায় স্বয়ংক্রিয় এনজাইম-প্রক্রিয়ার মাত্রাটিই উল্লেখ করব।

কেলাস জমা ছাড়া ইউরিক অ্যাসিডের দীর্ঘমেয়াদি যে রোগসমূহ হবার সম্ভাবনা থাকে (যেমন—হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, মেটাবলিক সিন্ড্রোম) সেগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরিক অ্যাসিডের স্বাভাবিক উচ্চ মাত্রা নির্ণয় করা কঠিন। স্পষ্ট করে বললে, ''রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য'' অনুযায়ী নির্ণীত উচ্চ মাত্রার ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য আছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা এতটাই বেশি (যেমন তাইওয়ানের চিন বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ) সেটাকে ওই দীর্ঘমেয়াদি রোগের কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার অনেক হৃদ্‌রোগীর রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ যথেষ্ট কম। ইউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে হৃদ্‌রোগ ও সমগোত্রীয় অন্যান্য রোগের কার্যকারণ সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। এই জন্য অতি সতর্ক চিকিৎসকরা এই দুই ধরনের ইউরিক অ্যাসিড সম্পর্কিত রোগের প্রতিরক্ষার কথা মাথায় রেখে ইউরিক অ্যাসিডের উচ্চ সীমা প্রতি ডেসিলিটারে ৬ মিলিগ্রাম ধরে নেন। কিন্তু এর ফলে অনেক ব্যক্তিকে ইউরিক অ্যাসিড কমানোর চিকিৎসা করতে হয় যেটা প্রয়োজনীয় নয়। তাই চিকিৎসা করে কতটা লাভ হবার সম্ভাবনা, আর ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বা কতটা (আর্থিক ক্ষতি সমেত), সে দুটোকে নিক্তিতে মেপে (খরচ-প্রাপ্তির তুল্যমূল্যের বিচারে) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসার প্রয়োজনে ইউরিক অ্যাসিডের স্বাভাবিক উচ্চ মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ৮ মিলিগ্রাম বলে গণ্য করে থাকেন। (Michel A Becker, MD, Editor *Uptodate*, March 2015)।

ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে কেন?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবার কোনো সরাসরি কারণ বার করা যায় না, আর এতক্ষণ সেই ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিড বাড়ার পেছনে থাকে কিছু অন্য রোগ। এই রোগগুলিতে ইউরিক অ্যাসিডের উৎপাদন বেড়ে যায় (যেমন ক্যান্সার)। এ ছাড়া কিডনির ইউরিক অ্যাসিডবর্জনের ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলেও ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায়। কিছু কিছু ওষুধ ব্যবহারেও (যেমন ডাইইউরেটিক গোত্রের কোনো রক্তচাপ কমানোর ওষুধ) ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে। আবার পিউরিন সমৃদ্ধ খাদ্য বা বিষ জাতীয় পদার্থ গ্রহণের ফলে অথবা জিনঘটিত সমস্যার জন্যও ইউরিক

অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এই কারণগুলির জন্য ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে সেটাকে সেকেন্ডারি (কোনো জানা কারণের জন্য) উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের অবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকম কোনো কারণ পাওয়া যায় না। বর্তমানের চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান সীমিত, তাই কারণ না-জানা বেশ কিছু রোগ আছে, যেমন উচ্চ রক্তচাপের রোগ। কারণ না-জানা উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের রোগের এই শ্রেণিকে প্রাইমারি হাইপারইউরিসিমিয়া বলে। এই ধরনের রোগীই সংখ্যায় বেশি, ও রোগ-প্রবণতা অনির্দিষ্টকাল ধরে থাকে।

পালং শাক বা মুসুর ডাল নয়, বেশি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রার জন্য সবচেয়ে দায়ী করা হয় স্থূলতা আর অ্যালকোহল (বিশেষ করে বিয়ার, হুইস্কি ও স্পিরিট জাতীয় পানীয়) পানকে। এ ছাড়া অধিক মাত্রায় মাংস ও সামুদ্রিক খাবারকে বিদেশি বৈজ্ঞানিকগণ সন্দেহের চোখে দেখেন, যদিও আমাদের দেশে ওই পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় খাবারে আমরা অভ্যস্তও নই, বা তেমন প্রাচুর্যও নেই।

উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের প্রাদুর্ভাব

ভৌগোলিক ও জাতিগত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হারে অস্বাভাবিক উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাদা চামড়ার পুরুষ আমেরিকাবাসীদের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ আর তাইওয়ানের চৈনিক পুরুষদের ২৫ শতাংশ হারে উচ্চ মাত্রার ইউরিক অ্যাসিড নির্ণীত হতে দেখা গেছে। কৈশোর উত্তীর্ণ পুরুষের মধ্যে এর সম্ভাবনা বেশি। প্রজননক্ষম মহিলাদের মধ্যে এর সম্ভাবনা বেশ কম। ইস্ট্রোজেন হরমোন মহিলাদের ইউরিক অ্যাসিডের প্রকোপ থেকে সুরক্ষা দেয়, কারণ স্বাভাবিক নিয়মে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে যে সকল মহিলা ইস্ট্রোজেন হরমোন গ্রহণ করে থাকেন তাদেরও সাধারণত ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে না।

ফালতু সমস্যা ডেকে আনলেন

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেড়িয়ে পড়ার মতো আপনি আবিষ্কার করে বসলেন আপনার রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি। অথচ আপনার এই সম্পর্কিত কোনো কষ্টই নেই। রাতের ঘুম উধাও। আত্মীয়স্বজন প্রথমেই আপনার প্রিয় মুসুর ডাল খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। প্রতিবেশী আগ বাড়িয়ে এসে উপদেশ দিয়ে গেলেন টোমাটো আর পালং শাক খাওয়া বন্ধ করতে। এক বেলা আমিষও বন্ধ হল। অনেক সময় পারিবারিক চিকিৎসকও খাওয়ায় রাশ টানতে হুকুম জারি করে ওষুধ খাবার নিদান দিয়ে যান। কোনো এক অজানা বা অল্পজানা রোগের ভয়ে আপনার বয়সই যেন বেড়ে গেল। খেয়াল করে দেখলে উচ্চমাত্রার ইউরিক অ্যাসিডের যতগুলি ক্ষতি তার মধ্যে গাউট, অর্থাৎ গাঁটে ইউরিক অ্যাসিডের কেলাস জমে যাবার ফলে যে রোগ হয়, সেটা মোটেই ভয়ের কারণ হওয়া উচিত নয়। মানুষের যত রকমের গাঁটের ব্যথা হয় তার মধ্যে যদি আপনাকে একটা বেছে নিতেই হয় তবে গাউট রোগটা নির্দ্বিধায় বেছে নিতে পারেন। কারণ গাউটই হল একমাত্র গাঁটের ব্যথা যেটা সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। আর গাউটের ব্যথার রোগ শুরু হওয়ার পরে রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করলে বিন্দুমাত্র আপোশ করা হয় না। তাই কেবল এই কারণে আগের থেকে ইউরিক অ্যাসিড মেপে রাতের ঘুম নষ্ট করার দরকার নেই।

ভিলেনের শক্তি যাচাই

ইউরিক অ্যাসিডের রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মনোসোডিয়াম ইউরেটের কেলাস জমে যেসব রোগ হয় সেই সব রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা পরিমাপযোগ্য। এভাবে প্রধানত তিন ধরনের রোগের সম্ভাবনা আছে— (১) বিশেষ গাঁটের ব্যথা বা গাউট ও টোফাই (২) কিডনিতে পাথর ও (৩) ইউরেট নেফ্রোপ্যাথি। এই শেষোক্ত রোগটি ছাড়া অন্য দুইটি রোগ তত ভয়ংকর নয় আর রোগ শুরু হলেই আপোশবিহীনভাবে চিকিৎসা করা চলে। ইউরিক অ্যাসিডের কেলাসের সম্পর্করহিত অন্য ধরনের যে রোগসমূহের জন্য ইউরিক অ্যাসিডকে দায়ী করা হয় (যেমন উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, দেহকোষের ইনসুলিনে অসংবেদনশীলতা বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স), সেগুলোর সম্ভাবনা রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সমানভাবে বাড়ে না, এবং ইউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে এই রোগগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক এখনও পুরো প্রমাণিত নয়।

ইউরিক অ্যাসিড গাঁটে ব্যথার যে রোগের সৃষ্টি করে তার কারণ হিসাবে গাঁটের ভেতরে মনোসোডিয়ামের কেলাস জমাকে দায়ী করা হয়ে থাকে। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা গাউটের রোগের নির্ভুল পূর্বাভাষ দিতে পারে না, তাই আলট্রাসোনোগ্রাম, বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন সিটি স্ক্যান (dual energy CT scan), আর্থোস্কোপি (গাঁটের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দেখা) ইত্যাদি করে রোগের সঠিক পূর্বাভাষ পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে—কাজের কাজ কিছু হয়নি। আসলে পরীক্ষাগারের আর ওষুধ নির্মাতাদের যোগসাজসে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা কাল্পনিক রোগের ভয়ে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই। গাউট নামক গাঁটের ব্যথা নিবারণের জন্য আগের থেকে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিরূপণের প্রয়োজনই নেই। রোগ শুরু হবার পরে চিকিৎসা শুরু করলেই চলে। কোনো আপোশ করতে হয় না।[১,২,৩]

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ও গাউটের ব্যথা সম্ভাবনা

একটি সমীক্ষায় ১৫ বছর ধরে ২০৪৬ জন সুস্থ পুরুষদের রক্তের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ও গাউটের ব্যথার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে অন্তত ৯ মিলিগ্রাম হলে প্রতি ১০০০ জন পুরুষের মধ্যে গাউটের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা ৫০ জনের, ৭ থেকে ৯ মিলিগ্রাম এর মধ্যে হলে গাউটের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা ৫ জনের, আর ৭ মিলিগ্রামের কম হলে গাউটের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা ১ জনের।[৪] অর্থাৎ গাউটের ব্যথার জন্য সুরক্ষার প্রয়োজনে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ৯ মিলিগ্রাম-এর কম হলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। নইলে কেবলই খরচ আর ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বরাদ্দ থাকবে। গাউটের আনুষঙ্গিক 'টোফাই'-এর সম্ভাবনা আজকাল অনেকাংশে কমে এসেছে। গাউট না হলে এটা সাধারণত হয় না। তবে গাঁটে ব্যথা নেই অথচ রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি, এমন ব্যক্তির যদি অন্য কারণে স্টেরয়েড বা অন্য কোনো ব্যথা কমানোর ওষুধ (Non steriodal anti-inflammatory agent, NSAID) গ্রহণ করতে হয়, তাদের কখনো কখনো 'টোফাই' দেখা যায়।

ইউরিক অ্যাসিড ও কিডনির রোগ

ইউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কিডনির অসুখের সম্পর্ক সোজাসাপটা নয়।[৫] কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাবৃদ্ধির সহাবস্থান দেখা যায় বটে, কিন্তু তাতে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অন্য কোনো কারণে কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাসের ফলে রক্ত থেকে কিডনির ইউরিক অ্যাসিড বর্জনের ক্ষমতাও হ্রাস পায়, ফলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও বেড়ে যায়।[৬,৭] তবে যদি দেখা যায়, রক্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবেও ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেশি, তবেই কিডনির রোগকে রক্তে অধিক ইউরিক অ্যাসিডের কারণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। যেমন ক্যান্সার রোগে প্রচুর পরিমাণে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের মৃত্যু হবার জন্য রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে, প্রস্রাবেও এই মাত্রা বাড়ে। এই রকম ক্ষেত্রে ''অ্যাকিউট ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি'' নামে রোগের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ক্রনিক কিডনির রোগে কিডনির কর্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য প্রস্রাবে স্বাভাবিক হারে ইউরিক অ্যাসিড বর্জিত হতে পারে না, ফলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিড কিডনির রোগের কারণ নয়, ফল মাত্র।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'দীর্ঘমেয়াদিভাবে রক্তে উচ্চমাত্রার ইউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতি' আর ক্রমবর্ধমান 'অনিরাময়যোগ্য কিডনির অসুখ'-এর যোগাযোগ আছে বলে মনে করা হয়। ইউরিক অ্যাসিডের একটু আধটু বৃদ্ধি কিডনিতে প্রদাহ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতিসাধন করে—এটা এখনও অপ্রমাণিত। যেটা প্রমাণিত তা হল কিডনির রোগসৃষ্টি করার জন্য রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অনেকটা বাড়তে হবে। (পুরুষদের প্রতি ডেসিলিটারে ১৩ মিলিগ্রামের বেশি হতে হবে আর মহিলাদের প্রতি ডেসিলিটারে ১০ মিলিগ্রামের বেশি।[৮] এত উচ্চমাত্রার ইউরিক অ্যাসিড বড়ো একটা দেখা যায় না। ইদানিংকালে ইউরিক অ্যাসিডের কেলাসজনিত সমস্যা (যেমন—টোফাই) কমে গেলেও ইউরিক অ্যাসিড সম্পর্কিত কিডনির অসুখের কমার কোনো লক্ষণ নেই। সেই জন্য মনে করা হয়, মাত্রাতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড সম্ভবত কেলাসিত না হয়েও কিডনির ক্ষতিসাধন করতে পারে।

ইউরিক অ্যাসিড কেলাস ছাড়া অন্যভাবে ক্ষতি করে কি?

গাউটের গাঁটের ব্যথা ও চামড়ার নীচে টোফাস জমা ছাড়া উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অন্য যে রোগগুলির একটা কারণ হিসাবে মনে করা হয় তাদের মধ্যে উচ্চরক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, ইনসুলিনে অসংবেদনশীলতা ও অনিরাময়যোগ্য কিডনির অসুখ উল্লেখযোগ্য। আশার কথা, এই সম্পর্কিত ভাবনায় সাধারণ মানুষ এখনও ব্যাকুল হয়নি, যদিও স্বার্থান্বেষী মহলের চেষ্টায় খামতি নেই! দেখে নেওয়া যাক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকগণ কী বলছেন। অন্যান্য বিষয়ের মতো, মানব শরীরের জৈবিক কর্মকাণ্ডে দুটো ঘটনার সমাপতন লক্ষ করলেই তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে বলে মনে করা যায় না। (তথাকথিত) উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা আর উপরে উল্লেখিত রোগসমূহের প্রকোপ—এই দুটো ব্যাপারই একটা বয়সের পরে স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে যায়। অর্থাৎ কার্যকারণ সম্পর্করহিতভাবে, একই ব্যাক্তির উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা আর একই সঙ্গে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি নির্ণীত হবার সম্ভাবনা আছে। তাই রক্তে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে ওই রোগসমূহের কারণ বলে ভাবা অযৌক্তিক। ইউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে উচ্চরক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ ও পাকাপাকিভাবে অকেজো কিডনির রোগের (chronic kidney disease, chronic renal failure) কার্যকারণ সম্পর্ক এখনও অপ্রমাণিত।[৮,৯]

আগেই বলেছি, কেলাস জমা ছাড়া উচ্চ মাত্রার ইউরিক অ্যাসিডের দ্বারা ঘটিত সম্ভাব্য অন্য রোগসমূহ, যেমন উচ্চরক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ ও অকেজো কিডনির রোগ হবার জন্য প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা পুরুষদের ১৩ ও মহিলাদের ১০ মিলিগ্রামের চেয়ে বেশি হতে হয়। এরকম উচ্চ মাত্রা বিশেষ দেখা যায় না। অপরদিকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, কিডনির রোগে রক্ত সাফ করার কাজে বাধা থাকার জন্যও রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে কারণ না মনে করে কিডনির অসুখের ফল বলে গণ্য করতে হবে। এই কার্যকারণ সম্পর্ক প্রমাণের অপেক্ষায় থাকাকালীন চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর নির্দেশিকা মেনে চলতে হয়।[৮]

কষ্টবিহীন উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় (asymptomatic hyperuricaemia) চিকিৎসা: বিশেষজ্ঞের নির্দেশিকা[৮]

আপাত সুস্থ ব্যক্তির প্রথাগত নিয়মমাফিকভাবে সুপ্ত রোগের অস্তিত্ব নির্ণয়ের লক্ষ্যে চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞগণ রক্তের সুগার, কোলেস্টেরলের পরীক্ষার সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের পরীক্ষা করা থেকে বিরত থাকারই পরামর্শ দিচ্ছেন। কোনো কারণে যদি রক্তের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নির্ণয় করা হয়েই যায়, আর সেটা বেশি পাওয়া যায় তবে কী করা উচিত? উচ্চ মাত্রার ইউরিক অ্যাসিডের মনোসোডিয়াম ইউরেটের কেলাস সম্পর্কিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের রোগলক্ষণ, অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ গাউটের গাঁটের ব্যথা না থাকলে এই রকম অবস্থাকে ''শারীরিক কষ্টবিহীন রক্তে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা'' (asymptomatic hyperuricaemia) বলে অভিহিত করা হয়। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ৮ মিলিগ্রামের চেয়ে কম হলে সেই মুহূর্তে এই বিষয়ে কোনো পরবর্তী পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ৮মিলিগ্রামের অধিক হলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে সেটা নিশ্চিত হতে হবে। আলোচনার খাতিরে, পরবর্তী পদক্ষেপ কেবল দুইটি কারণে সঙ্গত মনে করা যেতে পারে।

১. চিকিৎসার মাধ্যমে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করে ''মনোসোডিয়াম ইউরেটের কেলাস'' জমে গাউটের ব্যথা, চামড়ার নীচে টোফাই আর কিডনিতে পাথর জমার রোগের প্রকোপ থেকে সুরক্ষা।

২. এক নাগাড়ে গ্রহণ করতে হয় এমন কোনো (যেমন উচ্চ রক্তচাপের) ওষুধ বা অন্য বিষের কুপ্রভাব আছে কি না সেটা খুঁজে দেখা

ও তার প্রতিকার।

দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় রক্তে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ৭ থেকে ৮ মিলিগ্রামের মধ্যে হলে ৬ থেকে ১২ মাসের মাথায় পুনরায় রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিরূপণের নিদান দেওয়া হয়। যদি দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় এই মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ৭ মিলিগ্রামের কম হয় তবে পুনরায় ইউরিক অ্যাসিডের পরীক্ষা করবেন না। গাউট, টোফাই, বা কিডনিতে ইউরেট পাথর না থাকলে চিকিৎসাও করবেন না।

মনোসোডিয়াম ইউরেটের কেলাস জমা ছাড়া অন্য রোগগুলো (যেমন উচ্চরক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ ও অনিরাময়যোগ্য কিডনির অসুখ) এই অল্প মাত্রার উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের জন্য হয় না। কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে পারে। সেই নগণ্য সংখ্যার কারণগুলো বাদ দিলে, রক্তে ''উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায়'' শরীরের আভ্যন্তরীণ কারণগুলোর পাকাপাকি নিরাময় সম্ভব নয়; জীবনভোর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। অপর দিকে এই অল্প মাত্রার উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড গাউটের গাঁটের ব্যথা ও কিডনিতে পাথর জমার রোগ ঘটাতে পারে বটে, তবে সেই রোগ শুরু হবার পরে চিকিৎসা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, নিরাময়যোগ্য, কম খরচের ও এক-শো শতাংশ সফল। অল্প মাত্রার (প্রতি ডেসিলিটারে ৬ থেকে ৮ মিলিগ্রাম) উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডজনিত বিরল শারীরিক সমস্যার আপোশহীন ও সহজ সমাধান সম্ভব বলে জীবনভোর রোগ প্রতিরোধের ওষুধ প্রয়োগ করার কারণ নেই।

রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ৮-এর বেশি হলে প্রাথমিক হিসাবে পরিহারযোগ্য বাহ্যিক কারণ খুঁজে বের করে তার প্রতিকার করতে হবে। রোগবিবরণ লিপিবদ্ধ করা ও তার বিশ্লেষণ, শারীরিক পরীক্ষা ও কোনো বিষ জাতীয় বস্তুর সংস্পর্শ আছে কি না সেটা জানা দরকার। এরপর গুটিকয় নির্বাচিত আনুষঙ্গিক রক্ত পরীক্ষা—হিমোগ্লোবিন, শ্বেত কণিকার মাত্রা ও বিশ্লেষণ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কিডনির কর্মক্ষমতা নির্ণয় (ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন), ক্যালশিয়াম, লিভারের কর্মক্ষমতা নির্ণয় ও প্রস্রাব পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (৫০-৮০%) রক্তে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের কারণ পাওয়া যায়। চিকিৎসা শুরু করার আগে সমস্যার কারণ নির্ণয়ের প্রয়োজন। সম্ভাব্য কারণগুলিকে দু-ভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. উচ্চ মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার সমস্যা

মানুষের লিভারে পিউরিন নামক এক ধরনের জৈব-রাসায়নিক যৌগের পাচনক্রিয়ায় ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়। নিরামিষ বা আমিষ, যেকোনো খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে আমাদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে এই পিউরিন। কোনো কোনো খাবারে পিউরিনের পরিমাণ কম বেশি হতেই পারে, কিন্তু খাবারে পিউরিন বেছে খেলে ইউরিক অ্যাসিডের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কী এই পিউরিন? আদতে পিউরিন ''নিউক্লিওটাইড'' নামে একটি অপরিহার্য্য যৌগের অংশ, যেটা যেকোনো জীবকোষে জেনেটিক কোড, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ), রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (আরএনএ), অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট (এডিপি), অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (এটিপি) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ যৌগের উপাদান। পিউরিন ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ক্যালশিয়াম খেলে যেমন হাড় শক্ত হয় এমন প্রমাণ নেই, জন্ডিস রোগের চিকিৎসায় যেমন হলুদ খাবার বাধা নেই, তেমনই পিউরিনসমৃদ্ধ খাবার বাদ দিলে ইউরিক অ্যাসিডের প্রকোপ কমার সম্ভাবনা নেই। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে হলে অহেতুক মুসুর ডাল আর মাছ বাদ দিয়ে উদ্যোগের অপচয় না করে অন্য কিছু ভাবতে হবে। জন্মগত ত্রুটির কারণে কিছু খাদ্য পাচনের জারকের (enzyme) মাত্রার তারতম্যের কারণে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণেও অধিক ইউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়।* আবার জন্মগত ত্রুটি না থাকলেও কিছু আনুষঙ্গিক রোগে অধিক পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়।** সরাসরি খাবারে পিউরিনের আধিক্যের কারণে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা অল্পই। বরং তার চেয়ে, অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিরিক্ত ফ্রুকটোজ সমৃদ্ধ পানীয়, ও ওষুধ হিসাবে ডায়াইউরেটিক দলভুক্ত উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ (হাইড্রোক্লোর-থিয়াজাইড,ফুরোসিমাইড ইত্যাদি), নিকোটিনিক অ্যাসিড, প্যানক্রিয়াসের নির্যাস, ক্যান্সারের ওষুধ ইত্যাদি ইউরিক অ্যাসিড বাড়ায়। বি১২ দলভুক্ত ভিটামিনের অভাবেও ইউরিক অ্যাসিড বাড়তে পারে।

২. খাদ্যের পাচন ক্রিয়ায় ইউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের তুলনায় প্রস্রাবের মাধ্যমে কম মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড বর্জনের সমস্যা

লিভারে পিউরিনের চলতে থাকা পাচনের ফলে স্বাভাবিক মাত্রায় প্রস্তুত ইউরিক অ্যাসিড কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। ফলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। বেশ কিছু রোগের অনুষঙ্গ হিসাবে কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাসের ফলে স্বাভাবিক মাত্রার ইউরিক অ্যাসিড বর্জনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। অনিরাময়যোগ্য দীর্ঘমেয়াদি কিডনির ওষুধ, সিসার বিষক্রিয়া, যেকোনো কারণে শরীরে জলের পরিমাণ কমে বা হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে গিয়ে কিডনিতে রক্তপ্রবাহ ঘাটতির জন্য, ডায়াবেটিসের এক বিরল জটিলতা হিসাবে বা দীর্ঘকাল অভুক্ত থাকার জন্য রক্তে কিটোন যৌগের অধিক্যের জন্য ইউরিক অ্যাসিড বাড়তে পারে। বেশ কিছু রোগের আনুষঙ্গিক কুফল হিসাবে শরীরে অধিক ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয় যেটা কিডনির ইউরিক অ্যাসিড বর্জনের ঊর্ধ্বসীমার চেয়ে বেশি।*** আবার বেশ কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যেতে দেখা যায়।****

যদি একান্তই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমানোর দরকার হয়

যে সকল খাদ্যাভাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার মধ্যে খাবারের 'ক্যালোরি' নিয়ন্ত্রণের ও শরীরচর্চার মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কাজের বলে প্রমাণিত। এর পরেই মদ্যপানে রাশ টানতে বলছেন বিশেষজ্ঞগণ। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবারের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কম কাজের ও বিতর্কিত হলেও জেনে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে ইউরিক অ্যাসিড তৈরির কাঁচামাল বেশি।

পিউরিন সমৃদ্ধ খাদ্য (প্রতি ১০০ গ্রামে)	**পিরউরিনের পরিমাণ** (মিলিগ্রাম)
মেটে, লিভার	২৮৬
কিডনি ও অন্যান্য অরগান (হার্ট, ব্রেন)	২০০-২৩০

মুরগির মাংস, ডিম	১০০-১৩০
ভেড়ার মাংস	১২৭
শুয়োরের মাংস	১১৯
মাছ	১১৫
ডাল ও বিভিন্ন ধরনের বিনস্	৮০-২৩০
কালো মটর ডাল	২৩০
মুসুর ডাল	২২২
শিমের বীচি	২১০
মাশরুম,পালং, ফুলকপি, অ্যাসপারাগাস	৩০-৫০
পাঁউরুটি	১৬
ঘরে তৈরি সাদা আটার রুটি	১২
কটেজ চিজ	৮
দই, ইয়োগার্ট	৭
আনারস, নাশপাতি, প্লাম, পিচ	৬
ভাত	৬

পিউরিন সমৃদ্ধ পানীয় (মূলত বিয়ারেই থাকে)

পানীয় (প্রতি লিটারে)	পিউরিনের পরিমাণ (মিলিগ্রাম)
প্রচলিত বিয়ার	২০-২৭
লেজার বিয়ার	১৭
ঘরে তৈরি বিয়ার, ওয়াইন	৪
সিডার	০.৪

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড

কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।**** কখনো কখনো কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ''শাপে বর'' হয়ে দেখা দেয়। লোসার্টান নামে উচ্চরক্তচাপের ওষুধ আর কিছু কিছু ক্যালশিয়াম চ্যানেল ব্লকার দলভুক্ত উচ্চরক্তচাপের ওষুধ রক্তচাপ কমানোর সঙ্গে সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডও কমায়। উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের ওষুধ ''ফেনোফাইব্রেট'' অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমায়।

ইউরিক অ্যাসিডের ওষুধ কখন খেতে হবে?

অপেক্ষাকৃত কম খরচের আর অল্প আয়াসে করা গেলেও আপাত নিরীহ এই ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষার আগে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া উচিত। ইউরিক অ্যাসিড সম্পর্কিত রোগলক্ষণ না থাকলে লোকশ্রুতি আর মাস্টার হেলথ্ চেক আপের অংশ হিসাবে এই পরীক্ষা করবেন না। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ৮ মিলিগ্রামের বেশি হলে এবং দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় সেটা নিশ্চিত হলে, তবেই এ বিষয়ের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবার জন্য দায়ী কোনো রোগ আছে কি না বা কোনো ওষুধ এর জন্য দায়ী কি না সেটা নির্ণয় করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো কারণ পাওয়া যায় না। এমন অবস্থায় মোটা ব্যক্তিদের সবচেয়ে কার্যকরি উপায় হল ওজন কমানো। মদ্যপায়ীদের, বিশেষ করে বিয়ারে আসক্তদের, নেশায় রাশ টানতে হবে। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবারের তালিকার ওপরের দিকের খাবার বাদ দিলে লাভ হতে পারে। আনুষঙ্গিক রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনে ইউরিক অ্যাসিড বাড়িয়ে দেয় এমন যদি খান, চিকিৎসককে বলুন তার বিকল্প ওষুধ (সম্ভব হলে) দিতে। তেমন সুযোগ সুবিধা থাকলে যে ওষুধগুলো আসল কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফাউ হিসাবে ইউরিক অ্যাসিডও কমায় সেগুলোর ব্যবহার করতে হবে। এই সব করার পরেও যদি রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ৮ মিলিগ্রামের চেয়ে বেশি হয় কেবল তবেই বিশেষ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমানোর ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। এত ভেবেচিন্তে ওষুধ প্রয়োগ এই জন্যই করতে হয়, কারণ এটা আজীবন করতে হয়। প্রয়োজনটা ভালো করে যাচাই করে নেওয়াই উচিত।

পরিশিষ্ট

* Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase deficiency, Phosphoribosylpyrophosphate synthetase overactivity, Glucose-6-phosphatase deficiency (glycogen storage disease, type I)

** Myeloproliferative disorders, Lymphoproliferative disorders, Malignancies, Hemolytic disorders, Psoriasis, Obesity, Tissue hypoxia, Down syndrome, Glycogen storage diseases (types III, V, VII)

*** Preeclampsia, Obesity, Hyperparathyroidism, Hypothyroidism, Sarcoidosis, Chronic beryllium disease, Familial juvenile hyperuricemic nephropathy (FJHN), Medullary cystic kidney disease (MCKD), Glomerulocystic kidney disease, Genetic polymorphisms in urate transporter genes encoding transporters impaired for renal uric acid clearance.

**** Drug-or diet-induced, Diuretics (thiazides and loop diuretics), Cyclosporine and tacrolimus, Low-dose salicylates, Ethambutol, Pyrazinamide, Ethanol, Levodopa, Methoxyflurane, Laxative abuse (alkalosis)

তথ্যসূত্র

1. Bardin T, Richette P., Definition of hyperuricemia and gouty conditions. Curr Opin Rheumatol 2014; 26:186.
2. Ottaviani S, Allard A, Bardin T, Richette P. An exploratory ultrasound study of early gout. Clin Exp Rheumatol 2011; 29:816.
3. Ogdie A, Taylor WJ, Weatherall M, et al. Imaging modalities for the classification of gout: systematic literature review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2014.
4. Campion EW,Glynn RJ, DeLabry LO. Asymptomatic hyperuricemia. Risks and consequences in the Normative Aging Study. Am J Med 1987; 82:421.
5. Sanchez-Lozada LG, Tapia E, Rodrfiguez-Iture B, et al. Hemodynamics of hyperuricemia. Semin Nephrol 2005; 25:19).
6. Fessel WJ. Renal outcomes of gout and hyperuricemia. Am J Med 1979; 67:74.

Liang MH, Fries JF. Asymptomatic hyperuricemia: the case for conservative management. Ann Intern Med 1978; 88:666.

7. Bose B, Badve SV, Hiremath SS, et al. Effects of uric acid-lowering therapy on renal outcomes: a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant 2014; 29:406.
8. Fessel WJ. Renal outcomes of gout and hyperuricemia. Am J Med 1979; 67:74.
   Liang MH, Fries JF. Asymptomatic hyperuricemia: the case for conservative management. Ann Intern Med 1978; 88:666.
9. Bose B, Badve SV, Hiremath SS, et al. Efects of uric acid-lowering therapy on renal outcomes: a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant 2014; 29:406.
10. Michael A Becker, MD, Uptodate.com, April 2015, Grant/ Research / Clinical Trial Support : Takeda [Urate-lowering drug safety/efficacy (Febuxostat)]; Crealta Urate-lowering drug safety/efficacy (pegloticase)]; Ardea Biosciences / Astra Zeneca [Urate-lowering drug safety/efficacy (Lesinurad)]. Consultant/Advisory Boards: Takeda Pharmaceuticals [Gout drug development (Febuxostat)]; Crealta Pharmaceuticals. স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, একজন হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

Advt.

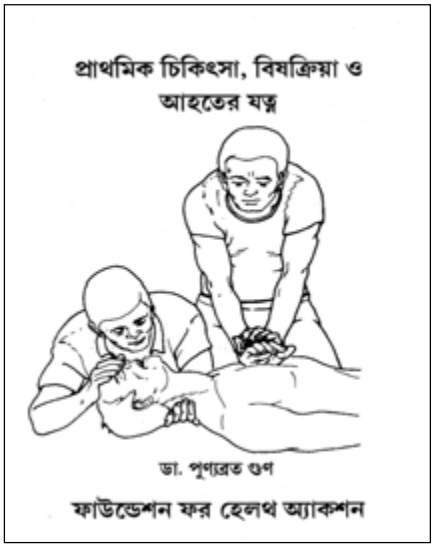

অবসাদ-একটি ঘুণপোকা

ডা. অনীক চক্রবর্তী

'ডিপ্রেশানের বাংলা নাকি নিম্নচাপ?'

মাঝেমধ্যেই কবির এই লাইন ধরে এগোলে আবহাওয়াগতভাবে আমরা গণ-ডিপ্রেশনের শিকার। কিন্তু ওই যে, শেষে কবি বলিয়াছেন 'ডিপ্রেশানের বাংলা আবার মন খারাপ'। আর এই লাইনটা মেনে এগোলে দেখি গোটা পৃথিবীর ম্যাপজুড়েই নেমে এসেছে ডিপ্রেশানের মেঘ। তাকে দেখতে হলে নিজের আপাতমুখী গৃহকোণ ছেড়ে একটু সামাজিক উঠোনে এসে দাঁড়াতে হবে।

যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যে এম.এ পড়ছে প্রজ্ঞা—দেড় বছর আগে সম্পর্ক ভেঙে চলে গিয়েছিল তার প্রেমিক, তারপর অন্য একজনকে বিয়ে, গুছিয়ে সংসার। প্রজ্ঞা এখনও গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার পেরোতে পারে না—ওখানেই কোথাও একটা থাকে ওরা। বন্ধুদের সামনে কুঁকড়ে থাকে, ভুল করে উঠে পড়ে অন্য অটোয়। তার প্রতিটি কথোপকথনে, চলাফেরায়, সিদ্ধান্তে, সিদ্ধান্তহীনতায় লেগে থাকে পুরোনো আঘাতের কালশিটে। বাইরে স্বাভাবিক দেখানোর মতো তথাকথিত 'পরিণত' সে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে তার ভেতরে পাড় ভাঙার শব্দ।

সৌম্যর সঙ্গে আবার এরকম কিছু ঘটেনি। কলকাতার বুকে একটি মেডিক্যাল কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। বাইরে থেকে দেখলে বন্ধুবান্ধব-প্রেম-কলেজ জীবন তাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু ভেতরে ওর এক অদ্ভুত শূন্যতা। কাব্যি না করে উপসর্গ হিসেবে বললেও ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়—পেটের ভেতরটা যেন অদ্ভুতভাবে ফাঁকা। বাইরে হাসছে, গল্প করছে, কিন্তু ভেতরে বইছে 'কী আর হবে এসব করে. . .' এর চোরাস্রোত। উদ্দেশ্যহীনতা আর অন্ধকারের উদ্‌যাপনে ভরে ওঠে তার ডাইরির পাতা, রোজ। কেউ জানে না।

আবার এদের অনেক দূরে, অন্য একটা ক্যানভাসের মানুষ অনন্তবাবুর ব্যাপারটাও অনেকটা এরকমই। ভালো মাইনের সরকারি চাকুরে, রিটায়ারমেন্টের আর সাত বছর বাকি। আদ্যন্ত সংসারী, ছেলেমেয়ে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অফিসের কম্পিউটারের সামনে বসলেই নিজেকে অপদার্থ মনে হয় তাঁর। রাস্তায়-ঘাটে-টিভি সিরিয়ালে—খবর কাগজ থেকে স্মার্টফোন-অ্যাপ-অনলাইন-স্টোর শব্দগুলো যেন তাঁকেই দেখে দাঁত বের করে হাসে। ফেসবুক-টুইটার-জিমেইল-এর লোগোগুলো তাকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় কী হু হু করে তাঁর চারপাশটা স্বার্থপরের মতো ডিজিটালাইজড হয়ে গেল আর তিনি কোথায় পড়ে থাকলেন। সারাদিন খিটখিটে হয়ে থাকেন অনন্তবাবু, কাজেও এখন ভুল হয় বেশি। সারাদিন গায়ে জড়িয়ে রাখেন মনখারাপের চাদর।

ঠিক মনখারাপ না, সঠিক বাংলায় বললে এঁরা প্রত্যেকেই 'অবসাদ'-এর শিকার। এবং দুনিয়া জুড়ে তাঁদের মতো আরও পঁয়ত্রিশ কোটি লোক ঘর করছে এই মারক রোগের সঙ্গে। মারক, কারণ সামাজিকভাবে একটা রোগের প্রকোপ মাপা হয় যে স্কেলে—সেই DALY স্কেলে (কোনো রোগের জন্য যতগুলি স্বাস্থ্যকর বছর নষ্ট হয়) অবসাদ এখন তৃতীয়—খোদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই তথ্য দিচ্ছে; ২০২০ সালের মধ্যে যে উঠে আসবে দ্বিতীয় স্থানে। মারক, কারণ প্রতি এক-শোজন অবসাদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে প্রায় সাতষট্টি জন জীবনে কখনো-না-কখনো আত্মহত্যা করার কথা ভাবেন, আর তার মধ্যে পনেরো জন শেষ করে দেন নিজের জীবন। বাকিরা সেটা করে না উঠলেও বিধ্বস্ত হয়ে থাকেন সমাজ ও কর্মজীবনে। শুধুমাত্র লাবডুব যাপন আর শ্বাসবায়ু টানা তো আর বাঁচা নয়! একবার ভাবুন সেই অদৃশ্য দানবের কথা—তাকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ, কিন্তু সে একটা লোকের মাথার ভেতর বসে আছে, সারা শরীরে লতিয়ে আছে। অবশেষে তার ভার এতই অসহ্য হয়ে উঠছে একজন মানুষের কাছে যার ফলে সে তাকে নিয়ে বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করছে।

এবার প্রশ্নটা হল—কেন? অবসাদের কারণ কী? প্রতিটি রোগের একটা জৈবিক দিক শেষতম স্তর পর্যন্ত খুঁড়ে না পাওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানের জয়পতাকা ঠিকঠাক ওড়ানো যায় না সেই রোগের মহাদেশে। তা অবসাদ-এর জিনগত দিক বা 'মস্তিষ্কের কেমিক্যাল লোচা' নিয়ে সেই খোঁড়াখুঁড়িটা এখনও জারি আছে। সেগুলো যত স্পষ্ট হবে, ওষুধ দিয়ে অবসাদের চিকিৎসা আরও উন্নত হবে, দিশা পাবে। কিন্তু এখানে অবসাদ নিয়ে এই সত্যিটা বুঝতেই হবে যে, অবসাদ আসলে আমাদের পারিপার্শ্বিক ও তাতে নিজের জীবনযাপন থেকে উদ্ভূত একটি রোগ। একটা 'রোগ'কে সামাজিকভাবে দেখার প্রক্রিয়া আমরা যত ভুলতে বসেছি, হয়তো তার

অবসাদ আসলে আমাদের পারিপার্শ্বিক ও তাতে নিজের জীবনযাপন থেকে উদ্ভূত একটি রোগ।

চিকিৎসা ও নিরাময় থেকে আমরা ততই দূরে চলে যাচ্ছি। 'জগৎ দুঃখময়'—গৌতম বুদ্ধ উবাচ। ফলে দুঃখময় জগতের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় আমাদের খুব স্বাভাবিকভাবেই 'মন খারাপ' হয়। কিন্তু অবসাদ তার থেকে

আলাদা মূলত গভীরতায় আর সময়ের ব্যাপ্তিতে। মন খারাপ যদি শরীর তোশকের ছারপোকা হয় তবে অবসাদ যেন তার কাঠের ভেতরে বাসা-বাঁধা ঘুণপোকা—সে আড়ালে থেকে কেটে ফেলছে আমাকে, আমার কাজ-ইচ্ছে-আনন্দ-স্বপ্নগুলোকে ছুঁড়ে ফেলছে একটা শূন্য পাতকুয়োর নীচে। তাই তাকে বুঝতে গেলে আমাদের একটু সময় নিয়ে পাঁচটা মানুষর দিকে ফিরে তাকাতেই হবে। প্রজ্ঞার মতো ধাক্কা খাওয়া মানুষগুলোর অন্ধকার বেডরুম, সামাজিক অবক্ষয়কে নিজের যন্ত্রণায় পালটে ফেলা সেন্সিটিভ সৌম্যদের ডাইরি বা প্রযুক্তির জয়যাত্রায় অসহায় হয়ে নিজেকে বাঁচার প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে নিতে চাওয়া অনন্তবাবুদের অফিস ডেস্কে একবার এসে দাঁড়াতেই হবে আমাদের।

আর এসে দাঁড়াতে হবে নামহীন হাজার দিন-আনি-দিন-খাই-দের উঠোনে। ছেলের পান্তার জন্য দিনের শেষে সাধের নুন জোগাড় করতে গিয়ে যে বাবাটা লড়ছে দিনমজুর হয়ে, মেয়ের মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের টাকার জোগাড়ের জন্য যে মা-টা রোজ ক্যানিং থেকে বাসন মাজতে আসছে বালিগঞ্জের আবাসনে, বছর পঁচিশের যে যুবতী 'সম্বন্ধ দেখা'র পাঁচখানা পরীক্ষায় ডাহা ফেল করে মাথা ঝুঁকিয়ে দশঘণ্টা জরির কাজ করে যাচ্ছে দিনের পর দিন, বছর সাতাশের যে যুবকটা গ্র্যাজুয়েট হয়ে মাসিক পাঁচশো টাকার চারখানা টিউশনি পড়িয়ে যাচ্ছে রোজ—তাদের আগে মানুষ বলে ধরতে হবে। তারপরে ধরা যাবে তাদের অবসাদের কারণগুলো। সম্প্রতি *ল্যান্সেট* নামে একটি বিখ্যাত পত্রিকা অবসাদ-গরিবি, এই একটিমাত্র সমীকরণের মাধ্যমে অবসাদকে ধরতে চেয়েছে। একটা মানুষের শেষ শক্তি দিয়ে লড়াই করার পরেও তার রোজকার হেরে যাওয়া, পড়ে পড়ে মার খাওয়ার যন্ত্রণা যে শেষত অবসাদ হয়েই বসত করবে তার ঘরে—এ তো একরকম অনিবার্যই। যদিও তার উপসর্গগুলো ব্লেজার-টাই-বিয়ার ক্যান শোভিত শহুরে অবসাদগ্রস্তের উপসর্গের থেকে অনেকটাই আলাদা। জমকের কলকাতা ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ধরে মিনিট পঁয়তাল্লিশ গিয়ে 'চেঙ্গাইল' বলে এক ছোট্ট জনপদের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোলে দেখা মিলবে এরকম বহু প্রান্তিক মানুষের—অবসাদগ্রস্ত। তাদের উপসর্গ কিন্তু কখনো গায়ে-হাত-পায়ে ব্যথা, আবার কখনো ক্ষুধামান্দ্য। কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে যখন কোনো নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যাবে না, তখন একটু ধৈর্য ধরে তাদের পরিবার বা পেশার কথা জিজ্ঞেস করলেই উঠে আসবে নিদ্রাহীন রাত বা সাংসারিক অশান্তির অন্ধকারগুলো। আর, সমস্ত জনপদ ছাড়িয়ে যখন সেই বাসভূমির দিকে পা বাড়াব আমরা—যেখানে ভিড় জমাচ্ছে বাস্তুহীন হাজার হাজার মানুষ তখন দেখব দীর্ঘশ্বাসে কালো হয়ে আছে সেই জনপদের মাটি। উন্নয়ন মানেই যখন শপিং মলে লিভাইসের টি শার্টে বিপ্লবীর ছবি আর মাথার ওপর শরীর এলানো ফ্লাইওভারে ন্যানোর স্পিডোমিটার; নগরায়ণ মানেই যখন ফ্ল্যাটবাড়িতে আমি-তুমি তুমি-আমির পারমুটেশান আর কম্বিনেশান তখন সেই উন্নয়নকে জায়গা করে দিতে গিয়ে ঝুপড়ি চেটে খাচ্ছে আগুনের লকলকে জিভ। আর মানুষের মতো দেখতে কিছু জীবরা ছড়িয়ে পড়ছে দীর্ঘশ্বাসের জনপদে—উদ্বাস্তু। আবার কখনো মিথ্যে তেলের গল্পে ভাজা উদ্যত বোমারু বিমান, কখনো ধর্মের ফুসকুড়ি ফাটিয়ে 'আক্রমণ'-এর যুদ্ধছবির পেছনে বাড়ছে একই রকম 'জীব' গুলোর সংখ্যা—উদ্বাস্তু। সভ্যতার চাবুক, উন্নয়নের লেলিহান আগুনে ওই মানুষগুলো মার খেয়ে, পুড়ে গিয়ে অবসাদের গভীর মৃত্যু উপত্যকায় বাস করছে। ওদের ওষুধ খাইয়ে অবসাদ দূর করার 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পটায় বড়ো ফাঁক রয়ে যাচ্ছে না?

তা বলে আবার ব্লেজার-টাই-বিয়ার ক্যানের অবসাদটাও 'শখের মনখারাপ' নয়। আসলে পৃথিবীর কোনো পত্রিকাই এখনও পর্যন্ত 'প্রাপ্তি=সুখ' এরকম কোনো সমীকরণ প্রকাশ করেনি। আমজনতার কাছে যদিও এই সমীকরণই নিউটনের চতুর্থ সূত্র। কেরিয়ারের তুঙ্গে থাকা, তর্কযোগ্যভাবে এই মুহূর্তে বলিউডের সবচেয়ে সফল অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন গেল জানুয়ারিতেই খোলাখুলি জানিয়েছেন তার গভীর অবসাদের কথা। শেষ পর্যন্ত তিনি উপযুক্ত চিকিৎসা করিয়ে বেরিয়েও এসেছেন তা থেকে। আবার সেলেব হিসেবে, মানুষের ভালোবাসা, সম্মান ও জাগতিক প্রাপ্তির হিসেবে তর্কাতীতভাবে দীপিকার থেকে বহুযোজন এগিয়ে থাকা হলিউড অভিনেতা রবিন উইলিয়ামস কিন্তু নিজের অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। গত বছর আগস্টে হয়ে গিয়েছিলেন ওই একশো অবসাদগ্রস্তের মধ্যে পনেরো জনের একজন। অতএব, শুধুমাত্র চাওয়া-পাওয়া বা কোনো একটা রকমভাবে আঘাত-যন্ত্রণাগুলোর কার্যকারণ হিসেবে মনের মতো জটিল এক জিনিসের অবসাদের মতো জটিলতর একটি প্রক্রিয়াকে হয়তো পুরোটা বুঝে ফেলা যাবে না। তাই 'তুমি তো জীবনে সবই পাচ্ছো হে, তাও কীসের এত মনখারাপ' টা বলা প্লিজ বন্ধ করুন; বা ভালো মনেই বলে ফেলা— 'আরে ছাড়ো তো বস, ভালো থাকো দেখি' বলাটাও। এ আসলে হাঁপানির রোগীকে টান ওঠার সময় 'আরে এই তো এত্তো বাতাস, শ্বাস নিতে চেষ্টা করো তো' বলার মতই অপদার্থতা। নিষ্ঠুরতাও বলা যায়। সারা বিশ্বে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ অবসাদে ভুগছেন, আর মজার ব্যাপারটা হল তার মধ্যে প্রায় দু-কোটি লোকই হল নীলগ্রহের অবিসংবাদী নেতা, প্রাচুর্যের শেষ কথা আমেরিকার বাসিন্দা। আসলে আঠারোতে যে ইঁদুরটা একটা কুড়ি হাজারের চাকরি, বাড়িটার একটু রেনোভেশান আর একটা অল্টোর লং ড্রাইভের স্বপ্ন দেখছে, তিরিশে গিয়ে সেটাই বদলে যাচ্ছে ঝাঁ-চকচকে থ্রি বিএইচকে আর হুন্ডা সিটিতে, পঁয়ত্রিশে গিয়ে সুইজারল্যান্ড আর ক্রুজপার্টি। আর এই গুণোত্তর প্রগতিতে এক্ষুনি চাই, আরও বেশি চাই

বলতে দিন একজন অবসাদগ্রস্তকে, রাখতে দিন তার যন্ত্রণাগুলোকে। নিজে কতটা ভালো আছি বা সেই মানুষটা কীভাবে ভালো থাকতে পারে সেটা না বলে শুধু অনুভব করুন তাঁর জায়গাটা। শুনুন—যেটা আসলে বেশ কঠিন একটি কাজ।

এর কলগুলোতে আটকে পড়েছে এই জেনারেশনের ইঁদুরগুলো, চুপিচুপি ভাঙছে ভেতরে। ফলে প্রাপ্তির খেলনানগরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে অবসাদ আর তা থেকে নেশাগ্রস্ততা, জীবনবিমুখ হয়ে থাকা আর আত্মহত্যাপ্রবণতা। এ যদি যায় এই জেনারেশনের কথা তবে অবসাদের আরেকটা বড়ো থাবার তলায় বাঁচছে লাঠি আর সাদাচুলের জরা-মানুষরা। জাগতিক বা মানসিক প্রাপ্তির ভাঁড়ার যে বয়সে এসে পূর্ণ হয়ে যায় সেই

বয়সে মানুষ শুধু চেনা মুখ খোঁজে, দিনের শেষে দু-টো কথা বলা, একটু হেসে ওঠার জন্য। কিন্তু আজ পরিবারের নিউক্লিয়াস পড়ে থাকে নিজের মতো, আর বৃদ্ধ ইলেকট্রনরা ঘুরে বেড়ায় অসীম অবসাদের শূন্যতায়। মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে, আর মূলত জরা-মানুষদের কারণেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, অবসাদের থাবার পরিধিটা। অবসাদের সমস্ত কারণগুলোর মধ্যে অন্তত এই কারণটা যদি একটু সান্নিধ্য পেত, সাহচর্য পেত প্রিয়মুখের, তবে হয়তো বৃদ্ধকাঠেদের ভেতরে ঘুণপোকার বনভোজন বন্ধ করা যেত।

তা দাদা, হ্যানাত্যানা করে সবই না হয় বুঝলাম, কিন্তু করণীয় কী? করণীয় হল নিজেকে স্বীকার করা এবং পাশের লোকটার দিকে একটু ফিরে তাকানো। সহানুভূতি নয়, সমানুভূতি দেখানো—যেটা আমাদের সমাজে বিরল। অবসাদগ্রস্ত একজন মানুষকে সহানুভূতি দেখানোটা বিপদ আরও ঘনীভূত করে তুলতে পারে; শুধু শুনুন। বলতে দিন একজন অবসাদগ্রস্তকে, রাখতে দিন তার যন্ত্রণাগুলোকে। নিজে কতটা ভালো আছি বা সেই মানুষটা কীভাবে ভালো থাকতে পারে সেটা না বলে শুধু অনুভব করুন তাঁর জায়গাটা। শুনুন—যেটা আসলে বেশ কঠিন একটি কাজ। এটাই বের করে আনতে পারে ভেতরের ঘুণপোকাটাকে। আর আপনি নিজে যদি নিজের ক্ষেত্রে বুঝতে পারেন সেই ঘুণপোকাটার অস্তিত্ব, তাহলে সবার আগে এটাকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করুন। অবসাদ (এবং অন্যান্য মানসিক রোগ) নিয়ে আমাদের সামাজিক ট্যাবু-টা যতক্ষণ না কাটবে, ততক্ষণ তার প্রতিক্রিয়াও অসম্ভব। এরপরে দরকার একটা মানুষ—যার কাছে ঘুণগুলো, ফোঁপরা হয়ে যাওয়া কাঠগুলো রাখা যায়। যদি তা নিতান্তই না পাওয়া যায় তাহলে দিনের পর দিন নিজের পাহাড়ে ধস না নামিয়ে একজন মনোচিকিৎসকের কাছ পৌঁছোনো ভালো। মানুষ কিন্তু লড়ছে নিজের মতো করে অবসাদের বিরুদ্ধে। অ্যামি ব্রুয়েল—তাঁর বাবা অবসাদের সঙ্গে লড়াইতে হেরে আত্মহত্যা করেন ২০০৩ সালে, তিনিও বহুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ঘুণপোকাটার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে। অবশেষে ২০১৩ সালে মূলত তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হয় 'প্রজেক্ট সেমিকোলন'। পূর্ণচ্ছেদে থামিয়ে দেওয়াই যায়, কিন্তু না, সেমিকোলনে বাঁচিয়ে রাখব নিজ জীবনের বাক্যটা—এই তার বক্তব্য। সেমিকোলনের ট্যাটুতে ট্যাটুতে আঁকা হচ্ছে অবসাদের সঙ্গে লড়াই করে মানুষের ফিরে আসার, 'বেঁচে থাকা'র কাহিনি। এই গভীর নিম্নচাপের সময়ে সবাই মিলে পাশাপাশি একসঙ্গে বেঁচে থাকাটাই অবসাদ পেরিয়ে নতুন কোনো কবিতার জন্ম দেবে, আশা এটুকুই।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনীক চক্রবর্তী, এম বি বি এস একটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যুক্ত আছেন শ্রমজীবী মানুষের জন্য চলা এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

Advt.

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

টুকরো খবর

সরকারি হাসপাতালে ওষুধ সংরক্ষণ

কিছুদিন আগে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে পরপর প্রসূতি-মৃত্যু নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। তার তদন্তের জন্য সরকারি কমিটিও গড়া হয়েছিল। সেই কমিটি মৃত্যুর জন্য কয়েকটি কারণকে দায়ী করে। তার মধ্যে একটা কারণ ছিল 'কোল্ড চেন' বজায় রাখতে ব্যর্থতা। প্রসূতি ও নবজাতকদের মৃত্যু ঠেকাতে সরকারি যে টাস্কফোর্স গড়া হয়েছে তার চেয়ারম্যান ডা. ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্যা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, ''কিছু ত্রুটি ছিল। সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা হয়েছে।''

'কোল্ড চেন' ব্যাপারটা কী? আমাদের অনেকেই পোলিও টিকা সংরক্ষণে 'কোল্ড চেন' ঠিকঠাক বজায় রাখা হচ্ছে না, এমন কথা শুনে এসেছি। সত্যি কথা বলতে কি, পালস পোলিও ব্যবহার করে পোলিও নির্মূল করার যে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা এদেশের সরকার লাগু করেছিলেন, সেটা অনেকাংশেই সফল। সফল হওয়ার পেছনে যেসব কারণগুলো ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল পোলিও টিকা সংরক্ষণে কোল্ড চেন ব্যবহার করায় অবহেলা অনেকটা দূর করা। কিন্তু শুধু পোলিও টিকা নয়, অন্য অনেক টিকার ক্ষেত্রেও কোল্ড চেন-এর গুরুত্ব রয়েছে; যেমন জলাতঙ্ক রোগের টিকা। কিছু কিছু ওষুধও (যেমন 'বায়োলজিকস' বলে পরিচিত অপেক্ষাকৃত নতুন ও দামি কিছু ওষুধ) কোল্ড চেন-এ রাখতে হয়।

চিত্র: ১. মুখে খাবার পোলিও টিকা
এরকম খোলা অবস্থায় বেশিক্ষণ রাখলে নষ্ট হয়ে যায়।

কোল্ড মানে ঠান্ডা, আর চেন কথাটার মানে শৃঙ্খল। অর্থাৎ ওষুধটা শুধু ঠান্ডায় রাখলেই হবে না, ওষুধ তৈরি থেকে রোগীর শরীরে খাওয়া বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ওষুধটা যাওয়া পর্যন্ত সেটাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে হবে। সাধারণভাবে এই তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে যেসব টিকা বা ওষুধ কোল্ড চেন-এ রাখতে হয়, তাপমাত্রার একটু হেরফেরে তাদের কার্যকারিতা সবার সমান কমে যায়, তা কিন্তু নয়। মুখে খাবার পোলিও টিকা হল খুব তাপমাত্রা-নির্ভর। সেটাকে ঠিকঠাক তাপমাত্রায় না রাখলেই বিপদ। আবার জলাতঙ্ক রোগের টিকা অনেকরকম আছে। সেগুলো সব ক-টা সমান তাপমাত্রা-নির্ভর নয়।

কোল্ড চেন দরকার হোক আর নাই হোক, যেকোনো ওষুধ তৈরির সময় ধরে নেওয়া হয় যে রোগীর শরীরে যাওয়া পর্যন্ত তার গুণমান খানিক

চিত্র: ২. মুখে খাবার পোলিও টিকা। এভাবে আইস বাক্সের মধ্যে করে নিয়ে গিয়ে হাটে-বাজারে পালস পোলিও টিকা লাগানো সম্ভব হয়েছিল

এদিক-সেদিক হবে। ধরুন কোনো ওষুধের তৈরি থেকে এক্সপায়ারি তারিখ পর্যন্ত ৩ বছর সময় আছে। যিনি ওষুধ তৈরির দু-দিন পরে সেটা খাবেন, আর যিনি সেই ওষুধ খাবেন ২ বছর ১১ মাস পরে, দু-জনে কি সমান ওষুধ পাবেন? না, তা কিন্তু পাবেন না, কারণ ওষুধ (ঠিকঠাকভাবে রাখলেও) ধীর লয়ে ক্রমশ নষ্ট হতে থাকে। এজন্য ওষুধে খানিকটা অতিরিক্ত ওষুধ যোগ করে রাখা হয়, যাতে এক্সপায়ারি তারিখের আগে পর্যন্ত এর যথেষ্ট কার্যকারিতা থাকে; একে বলে 'ওভারেজেস' (overages)। কোল্ড চেন-এ রাখতে হয় যেসব টিকা ও ওষুধ তারাও এর ব্যতিক্রম নয়। তফাত শুধু এই যে, অন্য ওষুধ ঘরের তাকে তুলে রাখলেও এক্সপায়ারি তারিখ পর্যন্ত যথেষ্ট কার্যকর থাকবে, কিন্তু কোল্ড চেন-এ রাখার ওষুধগুলো তা থাকবে না। তাকে রেফ্রিজারেটর-এ রাখতে হবে।

অন্য ওষুধ ঘরের তাকে তুলে রাখলেও এক্সপায়ারি তারিখ পর্যন্ত যথেষ্ট কার্যকর থাকবে, কিন্তু কোল্ড চেন-এ রাখার ওষুধগুলো তা থাকবে না। তাকে রেফ্রিজারেটর-এ রাখতে হবে।

সমস্যা অনেক। প্রথমত, কারখানা থেকে স্টকিস্ট হয়ে স্টোর (বা দোকান) এর মধ্যে দিয়ে ওষুধ নিয়ে আসেন যাঁরা, তাঁরা প্রায় কেউই কোন ওষুধ কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয় সে ব্যাপারে প্রশিক্ষিত নন, প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থাও নেই। কীভাবে সেটা হাসপাতালে (বা দোকানে বা ডাক্তারের চেম্বারে) এসে পৌঁছোল সেটা জানাও মুশকিল। হাসপাতালে রেফ্রিজারেটর-এর স্থান ও সংখ্যা অপ্রতুল, আর বিশেষ করে গ্রামীণ হাসপাতাল হেলথ সেন্টারে বিদ্যুৎ প্রায়শই ক্ষণপ্রভা! তারপর আসে হাসপাতালে কর্মীদের প্রশিক্ষণ। তাঁরা সবাই জানেন তো কোন ওষুধ কীভাবে

চিত্র ৩. ভ্যাক্সিন ভায়াল মনিটর ও তার ব্যবহার-নির্দেশিকা

রেফ্রিজারেটর-এ রাখা দরকার? যদি-বা জানেন, হাজার কাজের চাপে সেটা করে উঠতে পারবেন তো? এর উত্তর সন্তোষজনক নয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছুদিন আগে এ দেশে ১০টি রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়ে কোল্ড চেন বজায় রাখার ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করেছিল। ওই ১০টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও আছে। সুপারিশগুলোর একটা হল তাপমাত্রা ঠিকমতো রাখা হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখার জন্য বিশেষ কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব, বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া, রেফ্রিজারেটর যথা সময়ে ডিফ্রস্ট করা, গাড়িতে আইস প্যাক সরবরাহের ওপর কড়া নজর রাখা। ডিজিট্যাল প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রার দিকে নজর রাখা। এ ছাড়া কিছু কিছু প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ এই সমস্যা সমাধানে নানা দেশে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন টিকার ভায়ালের মোড়কে 'ভ্যাক্সিন ভায়াল মনিটর' লাগানো। সে জিনিসটা হল এমন কিছু যা টিকাটির (বা ওষুধটির) জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার চাইতে বেশি তাপমাত্রায় রং আস্তে আস্তে বদলায়। সাধারণত টিকার ভায়ালের মোড়কে একটা গোলাকৃতি রঙিন লেবেল থাকে, আর সেই গোল লেবেলের মাঝখানে থাকে একটা তাপ-সংবেদী চৌকো একটু হালকা রঙের লেবেল। ভায়ালটা যত বেশি গরমে থাকে, চৌকো লেবেলটির রং তত বদলে গাঢ় হয়ে যেতে থাকে। যখন ওই চৌকো লেবেলটির রং তার চারদিকে গোলাকৃতি বড়ো লেবেলের সঙ্গে একেবারে এক (বা তার চেয়েও গাঢ়) হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে টিকা বা ওষুধের যথেষ্ট কার্যকারিতা আর নেই, সেটা ব্যবহার করা উচিত হবে না।

সরকার সমস্যাটার দিকে নজর দিয়েছেন। দেখা যাক যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয় কিনা। এটা অনেক খরচ করে সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ ও এনআইসিইউ খোলার চাইতে অনেক সস্তা, এবং চট করে এইসব ছোটো ছোটো পদক্ষেপ জনসাধারণের নজরেও আসবে না। কিন্তু এতে আইসিইউ এনআইসিইউ খোলার চাইতে কম প্রাণ বাঁচবে না।

তথ্যসূত্র: *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২১ মে ২০১৫।

আমেরিকার সিডিসি কতটা নিরপেক্ষ?

পুরো নামটা যদিও সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, একে বিশ্বের মানুষ এর ছোট্ট ডাকনাম, 'সিডিসি' বলেই একডাকে চেনেন। এটি হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা বিষয়ক সরকারি নিয়ামক সংস্থা। কোন রোগ কীভাবে চিকিৎসা হবে, কোন টিকা দেওয়া খুব জরুরি। কোন রোগের জন্য সরকারি বরাদ্দ বাড়ানো বা কমানো দরকার, সেসব ঠিক করার পেছনে সিডিসি-র বড়ো ভুমিকা থাকে। আর কে না জানে আমেরিকা হাঁচলে বাকি বিশ্বের সর্দি লাগে! তাই সিডিসি যা বলে তা ভারতের মতো অনেক দেশের চিকিৎসা নীতিনির্ধারকদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সিডিসি নিজের সম্পর্কে নিজে কী বলে?

''দেশ ও বিদেশ থেকে আসা স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও (রোগ) আক্রমণ-আশঙ্কা থেকে আমেরিকাকে বাঁচাবার জন্য সিডিসি সপ্তাহে সাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে। দেশে রোগ শুরু হোক আর বিদেশে তীব্র হোক বা দীর্ঘমেয়াদি, নিরাময়যোগ্য হোক বা প্রতিরোধযোগ্য, মানুষের ভুল থেকে হোক আর ইচ্ছাকৃত আক্রমণ থেকে হোক, সিডিসি রোগের সঙ্গে লড়াই করে আর সমস্ত গোষ্ঠী ও নাগরিকদের এই লড়াইয়ে মদত দেয়।

আমাদের দেশের (আমেরিকার) স্বাস্থ্য সুরক্ষা বাড়ায় সিডিসি। দেশের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংস্থান হিসেবে সিডিসি উচ্চমানের বিজ্ঞানচর্চা করে ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে, ফলে জাতি ব্যয়সাপেক্ষ ও বিপজ্জনক স্বাস্থ্যঘটিত বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়; আর যদি সে বিপদ আসেই তো সিডিসি তার মোকাবিলা করে।''

সিডিসি চিকিৎসক ও জনসাধারণের জন্য যে স্বাস্থ্য-নির্দেশিকাগুলি দেয়, তাতে লেখা থাকে—''সিডিসি, সিডিসি-র পরিকল্পনাকারেরা, সিডিসি-র নির্দেশিকা লেখেন যে বিশেষজ্ঞরা, তাঁদের সঙ্গে যেসব সংস্থা বাণিজ্যিক দ্রব্যসমূহ (ওষুধ ইত্যাদি) তৈরি করে তাদের কোনোরকম আর্থিক বা অন্য স্বার্থ জড়িত নেই. . .'' (http://www.cdc.gov/about/organization/mission.htm)

এইসব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল* (সংক্ষেপে *বিএমজে*), যা হল পৃথিবীর সর্বমান্য ডাক্তারি বিজ্ঞানপত্রিকাগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য, সিডিসি-র নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে খুব সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলেছে। ফলে সিডিসি যে ধরনের বিজ্ঞানচর্চার ওপর নির্ভর করে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে যে নির্দেশিকা দেয়, আর যে টাকা সিডিসি পায়—সবকিছু নিয়ে জিজ্ঞাসাচিহ্ন উঠে গেছে। *বিএমজে*-র প্রবন্ধটি হল—Centers for Disease Control and Prevention: protecting the private good? *BMJ* 2015; 350:h2362. http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2362 Accessed on 28 May 2015 at 07-45 1ST)।

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এর এই প্রবন্ধ বলছে, ১৯৮৩ সালেই সিডিসি (ওষুধ/ডায়াগনস্টিক) শিল্প ও অন্যান্য প্রাইভেট দাতার কাছে থেকে 'উপহার' নেওয়ার অনুমতি পায়। ১৯৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কংগ্রেস' (ওদেশের 'কংগ্রেস' হল অনেকটা ভারতের পার্লামেন্টের মতো) সিডিসি ও শিল্প-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর জন্য এক আইন পাশ করে অলাভজনক সংস্থা 'সিডিসি ফাউন্ডেশন' তৈরি করে।

'সিডিসি ফাউন্ডেশন' ২০১৪ সালে ৫২ মিলিয়াম ডলার সংগ্রহ করে, যার মধ্যে ১২ মিলিয়ন ছিল নানা কর্পোরেট থেকে পাওয়া অর্থ। আর সিডিসি স্বয়ং ২০১৪ অর্থবর্ষে নানা সূত্র থেকে ১৬ মিলিয়ন ডলার 'শর্তসাপেক্ষ অনুদান' গ্রহণ করে; এই অর্থ আসে নানা কর্পোরেশন, ব্যক্তি

ও জনহিতকারী সংস্থার কাছ থেকে এদের মধ্যে অন্যতম ছিল 'সিডিসি ফাউন্ডেশন' নিজেই। 'শর্তসাপেক্ষ অনুদান' সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য।

বিএমজে-র প্রবন্ধ জানাচ্ছে, ''উদাহরণ হিসেবে বলা যা, ২০১২ সালে 'জেনেনটেক' (Genentech) কোম্পানি সিডিসিকে দান করার জন্য ৬ লক্ষ ডলার রেখেছিল। এই অর্থ দিয়ে সিডিসি ভাইরাসঘটিত হেপাটাইটিস-এর পরীক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার কাজ করে। 'জেনেনটেক' কোম্পানি ও তার মূল কোম্পানি 'রোশে' (Roche) 'হেপাটাইটিস সি' রোগের টেস্ট করার কিট ও ওষুধ তৈরি করে। ঘটনাচক্রে, ২০১২ সালের আগস্টে সিডিসি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬৫ সালে জন্ম নেওয়া সবার জন্য হেপাটাইটিস সি সংক্রমণের লক্ষণ খুঁজে পাবার জন্য 'বিস্তৃত (cohort) প্রারম্ভিক পরীক্ষা (screening) করার উপদেশ দিয়েছিল।'' *বিএমজে*-র প্রবন্ধ বলছে, এরকম নির্দেশ কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন ও বিতর্ক আছে।

এই ধরনের অনুদান গ্রহণ কীরকম স্বার্থ-দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় তার উদাহরণ *বিএমজে*-র প্রবন্ধে আরও রয়েছে। ''২০১০ সালে সিডিসি, সিডিসি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'ভাইরাল হেপাটাইটিস অ্যাকশন কোয়ালিশন' সংগঠনটি তৈরি করে। এই সংগঠন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সারা বিশ্বেই হেপাটাইটিস সি নিয়ে বিস্তৃত প্রারম্ভিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার কাজে সহায়তা করে। (ওষুধ/ডায়াগনস্টিক) শিল্প এই সংগঠনকে ২০১০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ২৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি খয়রাতি করেছে। এই সংগঠনে কর্পোরেট সদস্য আছে, যাদের মধ্যে রয়েছে অ্যাবট ল্যাবরেটরি, অ্যাবভিয়ে (Abbvie), গিলেড (Gilead), জ্যানসেন (Janssen), মার্ক (Merck), ওরাসিওর (Ora Sure Technologies), ও সীমেনস (Siemens) এবং এই শিল্পসংস্থাগুলোর প্রত্যেকটিই হেপাটাইটিস সি রোগটি পরীক্ষা করার জন্য বা চিকিৎসা করার জন্য নানা দ্রব্য বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত করে।

২০১২ সালের নতুন সিডিসি নির্দেশিকা তৈরি ও মূল্যায়ন করার জন্য একটি 'এক্সটার্নাল ওয়ার্কিং গ্রুপ' তৈরি করা হয়। সেই গ্রুপের ৩৪ জন সদস্য স্বার্থ-দ্বন্দ্ব (conflict of interest) ঘোষণার বিধিবদ্ধ ফর্মটি পূরণ করার পর দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে ৯ জনের (ওষুধ/ডায়াগনস্টিক) শিল্পের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে। ইন্সপেকটর জেনারেল-এর অফিস এক রিপোর্টে জানায়, আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণে সিডিসি-র 'এক্সটার্নাল অ্যাডভাইসর' দের প্রভাব বেশি, এবং ন্যায়নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা ধরাবাঁধা রকমের অবহেলা রয়েছে। এই অ্যাডভাইসরদের শতকরা ৯৭ জনই তাদের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ঘোষণার বিধিবদ্ধ ফর্মটি পুরো ভর্তি করেননি, এবং শতকরা ১৩ জন এই ফর্ম আদৌ জমা দেননি, কিন্তু তাতেও তাদের গ্রুপ ও মিটিং-এ নেওয়া হয়েছে।

অন্য যেসব ওষুধ প্রস্তুতকারক সিডিসি ফাউন্ডেশনকে অর্থ দিয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছে জ্যানসেন (২০১২-২০১৩ অর্থবর্ষে ১.৫ মিলিয়ন ডলার), এবং ২০১১-১২ অর্থবর্ষে মার্ক (Merck) (৯ লক্ষ ডলারের বেশি), জেনজাইম (সাড়ে সাত লক্ষ ডলারের বেশি), স্যানোফি-অ্যাভেন্টিস (ছয় লক্ষ ডলার) ও অ্যাবট ল্যাবরেটরিস (সাড়ে পাঁচ লক্ষ ডলার)।

বিএমজে-র এই প্রবন্ধ মধ্য-আমেরিকার আখচাষে যুক্ত মানুষদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি কিডনির অসুখের মহামারী নিয়ে নিরীক্ষাতে সিডিসি-র ভূমিকাকে সমালোচনা করেছে। ''এই নিরীক্ষা চালাতে চিনিশিল্প ১.৭ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। সমালোচকরা বলছেন যে (অসুস্থ) মানুষদের ওপর গবেষণা চলছে সেই মানুষদেরই (রোগসৃজনকারী) কাজ করাচ্ছে যারা, তাদেরই অর্থে . . . এই অবস্থায় চিনিশিল্প ওই অসুখের জন্য কতটা দায়ী সেটা নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখা হবে এমন ভরসা করা যায় না।''

বিএমজে-র ওই প্রবন্ধে বছরে ৫ লক্ষ রোগীকে দেখেন এমন একটি 'কম্যুনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র'-এর প্রধান কর্মকর্তার বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলছেন, যদিও সিডিসি দাবি করতেই পারে অর্থ কোথা থেকে এল তা দিয়ে তাঁদের নির্দেশিকা প্রভাবিত হয় না, কিন্তু ''অনেক সমীক্ষা পরিষ্কারভাবে, এবং বারবার, দেখিয়ে দিয়েছে যে, কে নিরীক্ষার অর্থ জোগাচ্ছে বা নির্দেশিকা তৈরি করছে, সেটা অনুযায়ী এগুলো বদলে যায়।''

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দ্য হিন্দু* ও *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র কয়েকটি সংখ্যা।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

টুকরো খবর

মৃত্যুর পর অঙ্গদান

আমরা ইরানের সেই মেয়েটির কথা জানি, ধর্ষিতা হবার মুহূর্তে যিনি ধর্ষককে মেরে ফেলেছিলেন, আর সেজন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই মেয়ে শেষ ইচ্ছে জানিয়েছিলেন, তাঁর লিভার, ফুসফুস, হৃদ্‌পিণ্ড প্রভৃতি যেন রোগীদের দেহে প্রতিস্থাপন করে তাঁদের বাঁচানো হয়।

সম্প্রতি এরকম একটা ঘটনা ঘটল এদেশেই। বাংলার ছেলে অর্কপ্রভ বাউল চেন্নাই-এর ইনফোসিস কোম্পানির চাকরি করছিলেন। নদীয়া জেলার রাণাঘাটের এই যুবক মাত্র ২৬ বছর বয়সে প্রাণ হারালেন। ৯ আগস্ট ২০১৫ সন্ধ্যেবেলায় চেন্নাইয়ে একটা বাসের তলায় চাপা পড়েন তিনি। এক অটোরিকশা চালক তাঁকে তুলে নিয়ে যান এসআরএম হাসপাতালে, সেখান থেকে তাঁকে নেওয়া হয় অ্যাপোলো হাসপাতালে। অবস্থার উন্নতি হয়নি, ক্রমে তিনি কোমায় চলে যান, আর ডাক্তাররা দেখেন যে তাঁর 'ব্রেইন ডেথ' হয়ে গেছে, সেটা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁর মা মনোরমা বাউল অর্কপ্রভর হাসপাতালে যান। সঙ্গে ছিলেন অর্কপ্রভর মামা ডা. প্রণবকুমার বিশ্বাস, কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের গাইনোকলজি বিভাগের অধ্যাপক। অ্যাপোলোর ডাক্তাররা বলেন, অর্ককে বাঁচানো সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর নানা প্রত্যঙ্গ দিয়ে অন্য মরণাপন্ন রোগীদের বাঁচানো যেতে পারে। ডা. বিশ্বাসের কথায়, ''একজন ডাক্তার হিসেবে আমি জানতাম যে অর্কর ব্রেইন ডেথ হয়ে গেছে মানে ওকে আর ফেরানো সম্ভব নয়। আর আমি এও জানতাম যে ও যুবক, ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তাজা, অন্য রোগীর দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপিত হলে ভালো কাজ করবে। কিন্তু আমার বোনের তো একটাই সন্তান অর্ক, তাই তাকে কথাটা বলতেও বাধছিল আমার। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি বোনকে একবার বলতেই ও একটুও দ্বিধা করল না, বলল, তাহলে আমার অর্কের যন্ত্রপাতিগুলো খুলে দাও। তারপর সে অঙ্গদানের জন্য সব কাগজে নির্দ্বিধায় সই করে দিল।'' ১৩ আগস্ট সকালবেলায় অর্কর প্রত্যঙ্গগুলো দেহ থেকে বের করে নেওয়া হল। ঘটনাচক্রে ১৩ আগস্টই হল বিশ্বের অঙ্গদান দিবস।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মনোরমা দেবী বলেন, ''আমার ছেলে আমাদের অনেকবার বলত, মা, আমি যদি মরে যাই তো আমার অঙ্গগুলো যেন অন্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য দেওয়া হয়। কথাগুলো

ও একটুও দ্বিধা করল না, বলল, তাহলে আমার অর্কের যন্ত্রপাতিগুলো খুলে দাও। তারপর সে অঙ্গদানের জন্য সব কাগজে নির্দ্বিধায় সই করে দিল।''

শুনে আমার খুব খারাপ লাগত, আমি ওকে খুব বকতাম। কিন্তু এখন সে তো সত্যিই চলে গেছে। তার অঙ্গগুলো দেবার কাজে এক মুহূর্তের জন্যও আমার দ্বিধা হয়নি।''

পরিবার শোকাচ্ছন্ন, কিন্তু অর্কর জন্য গর্বিতও। মনোরমা দেবীর কথায়, ''আমার ছেলেকে আমি হারিয়েছি, কিন্তু ও-ই তো এখন আরও কত মা-কে তাঁদের ছেলে বা মেয়েকে ফিরিয়ে দেবে। এই চিন্তাই এখন আমাদের সান্ত্বনা। সত্যি, শুধু যদি আমার ছেলেটা জানতে পারত কত লোককে ও বাঁচাল, তাহলে ওর চাইতে সুখী কেউই হত না।''

সূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৫ জানুয়ারি ২০১৫

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

টুকরো খবর

টেবিলের ওপর রাখার মতো মস্তিষ্ক-কলা

বিজ্ঞানীরা ৩টি প্রিন্টিং পদ্ধতিতে স্তরীভূত এক ত্রিমাসিক গঠন নির্মাণ করেছেন, আর তার মধ্যে স্নায়ুকোষও রয়েছে। এটা মস্তিষ্কের গঠনের অনুরূপ, আর ল্যাবরেটরিতে এটা ব্যবহার করে মস্তিষ্কের রোগ (যেমন স্কিৎজোফ্রেনিয়া) ও মস্তিষ্কের ওপর ওষুধের ক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

মস্তিষ্ক খুব জটিল গঠনের বস্তু। তার মধ্যে মোটামুটি ৮৬ বিলিয়ন (৮৬০০০,০০০,০০০) স্নায়ুকোষ আছে। মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী নিয়ে জানতে গেলে 'টেবিলের ওপর রাখার মতো' মস্তিষ্ক-কলা তৈরি করা গবেষকদের কাছে একটা বড়ো ও কঠিন চ্যালেঞ্জ।

৩ডি প্রিন্টিং পদ্ধতিতে স্নায়ুকোষ-সমন্বিত স্তরীভূত এই ত্রিমাত্রিক জিনিসটি নির্মাণ করে অস্ট্রেলিয়ার এআরসি সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ফর ইলেক্ট্রোমেটেরিয়াল সায়েন্স (এসিইএস) এই চ্যালেঞ্জ পূরণের দিকে একধাপ এগিয়ে গেল।

এরকম জিনিসের ডাকনাম হল 'টেবিলের ওপর রাখার মতো মস্তিষ্ক-কলা', আর এর মূল্য অপরিসীম। ওষুধ কোম্পানিগুলো সম্ভাব্য ওষুধগুলো নিয়ে নানা জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা করে দেখে একরকম কার্যকারিতা দেখতে পায়, তারপর আবার মানুষের ওপর পরীক্ষা করে অন্যরকম ফল পায়।

গবেষকদের কথায়, ''আমরা জানি না ব্যাপারটা কেন ঘটে, কিন্তু আমরা দেখি যে মানুষের মস্তিষ্ক অন্য জীবের মস্তিষ্কের চাইতে একেবারেই অন্যভাবে কাজ করে।'' 'টেবিলের ওপর রাখার মতো মস্তিষ্ক-কলা', যেটা মানব-মস্তিষ্কের

''আমরা এখনও পুরো মস্তিষ্ককে ৩ডি প্রিন্ট করার থেকে অনেক দূরে আছি, কিন্তু এখন আমরা কোষগুলোকে এমনভাবে সাজাতে পারছি যে মস্তিষ্ককোষের নেটওয়ার্ক (neuronal networks) তৈরি করা যায়

চরিত্রকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারবে, সেটা শুধু ওষুধের পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যই নয়, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ও নানা মস্তিষ্কক্ষয়-জাত রোগ (degenerative brain disease) ইত্যাদি নানা রোগকে বুঝতেও গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করবে।

এসিইএস ডাইরেক্টর ও গবেষণাপত্রের লেখক অধ্যাপক গর্ডন ওয়ালেস বলেছেন, এই সাফল্য 'টেবিলের ওপর রাখার মতো মস্তিষ্ক-কলা' তৈরির প্রচেষ্টায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, আর মস্তিষ্ককে বোঝার জন্য ও ওষুধ এবং অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কের রোগ সারানোর ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা করার এক হাতিয়ারও বটে। ''আমরা এখনও পুরো মস্তিষ্ককে ৩ডি প্রিন্ট করার থেকে অনেক দূরে আছি, কিন্তু এখন আমরা কোষগুলোকে এমনভাবে সাজাতে পারছি যে মস্তিষ্ককোষের নেটওয়ার্ক (neuronal networks) তৈরি করা যায়, আর এটা একটা বলার মতো সাফল্য।''

ছয়-স্তরবিশিষ্ট এই গঠন তৈরি করবার জন্য গবেষকদের প্রাকৃতিক কার্বোহাইড্রেট দিয়ে নির্দিষ্ট ধর্ম-বিশিষ্ট জৈব কালি (bio-ink) আবিষ্কার করতে হয়েছে। নির্দিষ্ট ধর্ম-বিশিষ্ট এইসব দ্রব্যকে এমনভাবে তৈরি করতে হয়েছে যাতে সেগুলো-মস্তিষ্ক-অনুরূপ এই গঠনটার সমস্ত কোষের মধ্যে ঠিকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে, আর তাতে যেন কোষগুলো একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এই জৈব-কালিকে ৩ডি প্রিন্টিং-এর উপযোগী করে তুলতে হয়েছে, আর তারপর সাধারণ কোষ-কালচার ব্যবস্থায় এগুলো যাতে ব্যবহার করা যায়, সেটাও দেখতে হয়েছে—এর ফলে ব্যয়বহুল বায়ো-প্রিন্টিং যন্ত্র প্রয়োজন হবে না। এইসব ব্যবহার করে তবেই বহুস্তরবিশিষ্ট গঠন পাওয়া গেছে, যা মস্তিষ্কের বহুস্তরীয় গঠনের খানিকটা অনুরূপ। মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষগুলো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে, আর সেখান থেকেই কাজ চালায়।

''এই পরীক্ষা জীববিজ্ঞানে ৩ডি প্রিন্টিং ও মেটিরিয়াল সায়েন্সের উন্নতি কাজে লাগানোর প্রয়োজন দেখিয়ে দিল; আর ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রিন্টার, যেটা আরও সূক্ষ্ম জিনিস তৈরি করতে পারবে, তার পথ পরিষ্কার করল আজকের এই গবেষণা।'' ওয়ালেস বলেছেন।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/3-D-printed-brain-tissue-to-help-combat-disease/articleshow/48346293.cms

সম্পাদকীয় মন্তব্য: ''আমরা এখনও পুরো মস্তিষ্ককে ৩ডি প্রিন্ট করার থেকে অনেক দূরে আছি...'' অধ্যাপক গর্ডন ওয়ালেস-এর এই মন্তব্যটি অনুধাবনযোগ্য। যেখানে অন্য জীবের মস্তিষ্কে মানবমস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী ও রোগ ব্যবহার করার কাজে ব্যবহার করতে পারা যাচ্ছে না বলেই 'টেবিলের ওপর রাখার মতো মস্তিষ্ক-কলা' (bench-top brain tissue)-র প্রয়োজন হচ্ছে, সেখানে পুরো মস্তিষ্ক প্রিন্ট করার থেকে বহুদূরে থাকা এই মডেলটিরও আবশ্যিকভাবেই বহু সীমাবদ্ধতা থাকবে। ভবিষ্যতে এই পথে অনেক উন্নতি হতে পারে, কিন্তু এখনই অন্য জীবের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণার বদলে এই কৃত্রিম 'টেবিলের ওপর মস্তিষ্ক-কলা' দিয়ে পুরো কাজ চলবে না।

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.
P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700089

নারীর চরম যৌন তৃপ্তি

সুধী পাঠক, হেডলাইন দেখে চমকে যাবেন না। এটা কোনো নীল ছবির রিভিউ বা হলুদ বইয়ের ইন্ট্রো নয়। নারী-পুরুষের যৌন মিলনের অত্যন্ত একটি স্বাভাবিক কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে গোপন রাখা বিষয়ের ওপর দু-চার কথা বলা হচ্ছে।

কথাটা হচ্ছে ফিমেল অরগ্যাজ্‌ম (Female Orgasm)। এর উপযুক্ত কোনো ছোটোছোটো পারিভাষিক শব্দ না পেয়ে বোধগম্য বাংলা ভাষার আশ্রয় নেওয়া হল। মেল অরগ্যাজ্‌ম (Male Orgasm) অর্থাৎ পুরুষের চরম যৌনতৃপ্তি নিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের একটা ধারণা আছে। বীর্যস্খলনের সঙ্গে যে স্বাভাবিক তৃপ্তি সেটাই পুরুষের orgasm। নারীদের ক্ষেত্রে দৃশ্যত (গোপনভাবেও) এরকম কিছু দেখা যায় না। কিন্তু তারও পুরুষের সমতুল্য এই যৌনতৃপ্তি হয়।

হস্তমৈথুন বা যৌনক্রিয়ায় চরম অবস্থায় এই orgasm হয়। এই সময় নারীদেহের নানারকম পরিবর্তন হয়। স্তনের আয়তন বৃদ্ধি হয়। শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত গতির হয়। যোনির নীচের এক-তৃতীয়াংশে ৩-১৫টা সংকোচন হয়। এবং যোনির মধ্যে রস নিঃসরণ হয়। এ ছাড়া শ্রোণী বা পেলভিসের বিভিন্ন পেশির স্বতঃসংকোচন হয়। এবং মানসিকভাবে নারী চরম যৌন তৃপ্তি পায়। এই পর্বটা স্থায়ী হয় ৩-১৫ সেকেন্ড।

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে কতগুলো তথ্য উঠে এসেছে। যৌনাঙ্গ ক্লাইটোরিসের উদ্দীপনা (হস্তমৈথুন করে) করে বা যৌনক্রিয়া করে অথবা একই সঙ্গে দুটোই করে এই orgasm পাওয়া যায়। দেখা গেছে ১০% মহিলার কখনো orgasm হয়নি। কম বয়সে orgasm কম হয়, নারীর বয়স ৩৫ বা তার বেশি হলে orgasm হওয়ার সংখ্যা বাড়ে। একটা সমীক্ষা

ছোটোবেলা থেকে যৌনতা, যৌন আনন্দ সম্পর্কে তাকে নেতিবাচক শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্তান উৎপাদনের বাইরে যৌনতৃপ্তিকে গুরুত্বহীন বলে শেখানো হয়।

বলছে পুরুষ সঙ্গীদের হিসাব অনুযায়ী ৮০% নারীর orgasm হয়েছে। কিন্তু আলাদা করে সেই নারীদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে ৬০% নারীর orgasm হয়েছে। অর্থাৎ তারা পুরুষ সঙ্গীকে খুশি করতে মিথ্যা করে এই কথা বলেছে। কিন্তু কেন? এখানেই চলে আসছে নারীর বেড়ে ওঠায় সমাজের ভূমিকা।

তথাকথিত উন্নত দেশেও, নারীকে ছোটোবেলা থেকে নানারকম নিষেধের ঘেরাটোপে থাকতে হয়। এখানে সমাজের একটা বড়ো হাতিয়ার হচ্ছে ধর্ম। যতটুকু সে শেখে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তত্ত্বাবধানে। তাই ছোটোবেলা থেকে যৌনতা, যৌন আনন্দ সম্পর্কে তাকে নেতিবাচক শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্তান উৎপাদনের বাইরে যৌনতৃপ্তিকে গুরুত্বহীন বলে শেখানো হয়। এইসব শিক্ষাই নারীর orgasm-এ বাধা হয়ে ওঠে। দেখা গেছে যাদের orgasm হয় না তাদের মেজাজ খিটখিটে, অবসাদ, নানারকম শারীরিক কষ্ট, এমনকী যোনিস্রাব পর্যন্ত হয়।

সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক!

সিঁদুর—বিবাহিতা মহিলাদের সিঁথিতে সিঁদুর পরা অবশ্য কর্তব্য— অন্যথায় স্বামীর অমঙ্গল হয়।

এই প্রথা বা মিথ যাই বলা হোক প্রধানত পূর্ব ভারত এবং হিন্দু বাঙালিদের একান্ত নিজস্ব।

এই প্রথা বা মিথ কবে কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক ভিত্তি আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু আপামর হিন্দু বাঙালি যে আজও এই লাল গুঁড়োর বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টিপ, অলংকারের মতো সিঁদুর অন্য প্রদেশে প্রসাধনের একটা অঙ্গ, কিন্তু বিবাহিতা মহিলাদের পরতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। সিঁদুরের কাছে এখনও সমস্ত শিক্ষা, আধুনিকতা মাথা নুইয়ে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ত্বকে ক্ষতি না হচ্ছে—"সিঁদুর পরবেন না" কথাটা বলাও কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। কিন্তু যখন ক্ষতি হচ্ছে? কী ক্ষতি হয় বলার আগে সিঁদুরের রাসায়নিক যৌগগুলো জেনে নেওয়া যাক। প্রাচীনকালের বা দেশজ সিঁদুর যা এখনও বিহার, উত্তরপ্রদেশে ব্যবহার হয়—সেটা তৈরি হয় "সিনাবার" নামক প্রাকৃতিক আকর থেকে—এতে থাকে মারকারি (২) সালফাইড। আর গাঢ় লাল রঙের সিঁদুর (যা ঠিক সিঁদুরে রঙের নয়) বা এখন কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি হয় তাতে প্রধান যে যৌগটি থাকে তা হল লেড অক্সাইড যা লেড টেট্রাক্সাইড।

মেটে সিঁদুর বা দেশজ সিঁদুর থেকে মারকারি বা পারা শরীরে ঢোকার ভয় থাকে, দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে বিষক্রিয়াও হতে পারে।

আর গাঢ় লাল 'লেডযুক্ত' সিঁদুরে খুব বেশি দেখা যায় যে সমস্যা তা হল—contact dermatitis বা স্পর্শজনিত ত্বকের প্রদাহ। এর ফলে যেখানে সিঁদুরের ছোঁয়া লাগে সেই জায়গায় চুলকানি, ফুসকুড়ি, ত্বক মোটা কালচে হয়ে যাওয়া, সিঁথির চুল উঠে যাওয়া এইসব সমস্যা হয় যা বেশ কষ্টকর। এমনকী কপালে যেখানে সিঁদুরের টিপ পরা হয় সেখানেও এইসব সমস্যা দেখা যায়। স্টেরয়েড জাতীয় মলম ও চুলকানি কমার অ্যালার্জির ওষুধ খেলে সাময়িক আরাম হয়, কিন্তু সিঁদুরের স্পর্শ পেলেই আবার রোগ রে রে করে তেড়ে আসে। এইসব মহিলাদের (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) বোঝানো খুব মুশকিল। কারণ রোগিণী মানলেও সমাজ-পরিবার মানে না যে সিঁদুর থেকে কোনো ক্ষতি হতে পারে এবং ক্ষতি হলে তা এড়িয়ে চলতে হবে।

আবার কঙ্কাল কাণ্ড

গত কয়েকমাস আগে (১১ জুন, ২০১৫) ৩ নং রবিনসন স্ট্রিটের বাড়িতে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা সমস্ত কলকাতাবাসীকে হতচকিত করে দিয়েছিল। বিভিন্ন গণমাধ্যমে চলল সেই ঘটনার বিভিন্নরকম বিশ্লেষণ ও

ব্যাখ্যা। উঠে এল বিভিন্ন প্রশ্ন ও তর্কবির্তকের অবকাশ। তার মধ্যে কিছু প্রশ্নের উত্তর গত সংখ্যাতেই দেওয়া গেছে। আরও কিছু অভিনব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নতুন করে কলম ধরতে হল। সাধারণ মানুষের মনে জাগা এমনিই কতকগুলো প্রশ্নের (যা আপাত দৃষ্টিতে সরলসাধারণ মনে হলেও আসলে বিভিন্ন অস্পষ্টতার দোষে দুষ্ট) যথাযথ যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হল। ঘটনার পরে পার্থ দে-কে মানসিকভাবে অসুস্থ বলা হয় এবং হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা শুরু করা হয়। প্রশ্ন উঠল—পার্থ দে কি সত্যিই মানসিকভাবে অসুস্থ? তাঁকে মানসিকভাবে অসুস্থ কেন মনে করা হচ্ছে? তাঁর ঘর থেকে একটি মানুষ ও দু-টি কুকুরের কঙ্কাল উদ্ধার হয় এবং মানুষের কঙ্কালটি পার্থ দে-র মতানুযায়ী তাঁর. দিদি দেবযানীর.। বিরুদ্ধ যুক্তির ঝড় বইতে লাগল। বিশেষ বিশেষ ধর্মে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে খাদ্যবস্তু দান করা হয়। যদি পার্থ তাঁর দিদি দেবযানীর মৃতদেহের সামনে দিনের পর দিন খাবার উৎসর্গ করে থাকে তবে সেখানে অসুস্থতা খোঁজা হবে কেন? হতেই পারে ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু বিশ্বাস তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল।

কিন্তু মানসিক রোগের প্রামাণ্য সংজ্ঞায় বলা আছে, যে বিশ্বাস ধারণা ও আচরণ সমাজের বৃহত্তর অংশে গৃহীত নয় বা সমাজের বৃহত্তর অংশ যা অভ্যাস (Practice) করে না সেই বিশ্বাস, ধারণা ও আচরণ স্বাভাবিক বলে গণ্য হতে পারে না। (সমাজের একটি অংশ) যে আচরণ করেন শ্রীযুক্ত পার্থ-র আচরণ কি কোনোভাবেই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে? সব ধর্মের নির্দিষ্ট সময়ের পরে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা আছে। প্রশ্ন এল—মিশরীয় সভ্যতায় তো মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, তবে এই বিশেষ আচরণে এত হইহই কেন? তিন হাজার বছর আগের কোনো বিশেষ সভ্যতায় যে অভ্যাসের (Practice) চলন ছিল এবং যার প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ অন্য ছিল তার সঙ্গে আজকের এই আচরণ কোনোভাবেই তুলনীয় হতে পারে না। কারণ সেই একই—**সামাজিক ও সাংস্কৃতিক** (Social and Cultural) **মূলাধারের অভাব**। এই বিশেষ ঘটনা মানুষের মনে ভয়, রহস্য, কৌতূহল তৈরি করেছে, কারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণা, তাকে সুস্থ সামাজিক জীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল। প্রাত্যহিক জীবনযাপনে (অর্থাৎ রোজগার করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, স্বাভাবিক মেলামেশা করা) ব্যর্থ হওয়া মানসিক অসুস্থতারই লক্ষণ।

বাজার চলতি গণমাধ্যমে প্রকাশ পেল এক নতুন দিক—যেখানে বাবা মারা গেলে পরমূহূর্তে তা আত্মীয়দের কাছে 'বডি' হয়ে যায় সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মৃত বোনের মৃতদেহকে জীবিত মনে করে খাবার দিয়ে যাওয়া নাকি অত্যন্ত মানবিক!!! মানবিকতার এই অভিনব সংজ্ঞা, মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞদের চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একজন মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের বুদ্ধি (Intellectual functioning), বিচারক্ষমতা (Judgement) অন্তর্দর্শন (Insight) যখন রোগের প্রকোপে প্রভাবিত হয় তখন মানবিকতার খাতিরে নয় রোগের প্রভাবেই সে বিভিন্ন অযৌক্তিক অসামাজিক আচরণ করে থাকে। তাতে মানবিকতার দোহাই দেওয়া যায় না।

সর্বোপরি এ কথা বলা যেতে পারে অস্বাভাবিক আচরণের পিছনে সামাজিক একাকীত্ব (Social isolation), বংশগত (Heriditary) বা পরিবেশগত (Environmental) বিভিন্ন কারণ কাজ করতেই পারে, কিন্তু তাই বলে এই ধরনের আচরণকে মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ না বলে অন্য কোনো উপাদান দিয়েই ব্যাখ্যা করলে তা হবে মূর্খের স্বর্গ রচনা করা।

ঘুমিয়ে হাঁটা বা স্লিপ ওয়াকিং

একটা মানুষ ঘুমিয়ে হাঁটছে। এটা ওটা করছে কিন্তু কিছু মনে রাখতে পারছে না। অদ্ভুত ব্যাপার। তাই এই অবস্থাটা নিয়ে গল্প, উপন্যাস, সিনেমা প্রচুর হয়েছে। এই সমস্যার ডাক্তারি নাম হচ্ছে sleep walking বা ঘুমিয়ে হাঁটা। অবস্থাটার আর একটি নাম আছে সমনামবুলিজম(Somnumbulism)।

কী হয়: আক্রান্ত মানুষটি ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে উঠে হাঁটতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই সে ছোটোখাটো জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগা এড়িয়ে যেতে পারে। আবার কিছু ক্ষেত্রে খোলা ছাদ থেকে পড়ে গেছে এমনও হয়েছে। হাঁটার সময় মানুষটির মুখচোখ থাকে ভাবলেশহীন। পরে তার কোনো স্মৃতি থাকে না।

কী করা উচিত নয়: ডেকে বা ধাক্কা দিয়ে জোর করে জাগানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ তাহলে সে খুব বিভ্রান্ত থাকে। আর ধাক্কাধাক্কি বা ঝাঁকানোকে, সে ভাবে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে। তাই সে ঘোরের মধ্যেই পালটা আক্রমণ করে ফেলতে পারে।

কী করা উচিত: সব থেকে ভালো হচ্ছে তাকে আলতো করে গাইড করে আবার বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেওয়া।

রোগের আরও দুই রূপ

ক. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাওয়া (sleep related eating): কিছু মানুষ ঘুমের মধ্যে হেঁটে গিয়ে ফ্রিজ খুলে বা খাবার ঘরে গিয়ে খেয়ে আসে। যথারীতি পরে কিছু মনে রাখতে পারে না।

খ. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যৌনতা (senomnia): এটাও একটা অদ্ভুত আচরণ। অনেক সময় ঘুমের মধ্যে হস্তমৈথুন করে। কেউ কেউ ঘুমের মধ্যেই তার সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গম করে। পরে তার স্মৃতি থাকে না।

কী কারণ: কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। অনেকক্ষেত্রে কয়েকদিন ঘুম না হলে হতে পারে। এই সমস্যাটি সাধারণত নিদ্রাচক্রের অপেক্ষাকৃত গভীর ঘুম NREM অংশে হয়ে থাকে।

ভবিষ্যৎ কী: এই সমস্যা সাধারণত বাচ্চাদের হয়। ৪-৮ বছর বয়সে সব থেকে বেশি হয়। কৈশোর পেরোলে সাধারণত আপনাআপনি ঠিক হয়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্কদের ঘুমিয়ে হাঁটা কম হয়। খুব প্রয়োজন না হলে ওষুধ দেওয়া হয় না।

কাঠগড়ায় কেবল নব্য প্রজন্মের ডাক্তার

ডা. অনীক চক্রবর্তী

গত ১৬ জুন, ২০১৫ *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত 'মেধা থাকলেই ভালো ডাক্তার হয় না' লেখাটির প্রসঙ্গ ধরে এই লেখার অবতারণা। সুলিখিত নিবন্ধে উপমা ও ভাষার ব্যবহার চোখ টানে, এবং একইসঙ্গে চোখ টানে তাতে প্রাসঙ্গিক কথাগুলি এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও। তবে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পাঠরত বা সদ্য পাশ করে বেরোনো 'নব্য' ডাক্তারদের সামগ্রিক মনোভাব যথেষ্ট যথাযথভাবেই লেখাটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাই সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে পালটা আক্রমণ নয়, এ লেখার উদ্দেশ্য লেখকের বক্তব্যের একটা অন্য দিক্‌নির্দেশের চেষ্টা মাত্র।

বক্তব্যের প্রথমাংশ জুড়ে 'মেধাবী' ছেলেমেয়েরা মূলত প্রতিপত্তি ও টাকাপয়সার জন্যই ডাক্তারি পড়তে আসছেন—এই ছবিই তুলে ধরা হয়েছে। এতে আলাদা আলাদা তুলির আঁচড়গুলো ঠিক থাকলেও গোটা ছবিটা খুব বার্তাবহ হয়ে ফুটে উঠছে না। সমাজ, তার চাহিদা, তার 'কেরিয়ার মূল্যায়ন' উচ্চমাধ্যমিকের ঘাট পেরিয়ে আসা একজন ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে যে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন নয় কি? যে ছেলেটা গত দশ বছর ধরে টিভির সামনে বসে সামাজিক স্ট্যাটাসের সংজ্ঞা গিলল, যে মেয়েটা খবরের কাগজ হাতে ক্লাস ফোর থেকে উন্নতির মেগা সিরিয়াল দেখল—সে কোন জাদুবলে উচ্চমাধ্যমিকে ভালো নম্বর পেয়ে জয়েন্ট না দিয়ে নিজের পছন্দের অন্য কোনো বিষয়কে গভীরে জানার জন্য অনার্স পড়বে? 'মেধা'র সংজ্ঞা নিয়ে তর্কটা চলুক, কিন্তু শিক্ষার যে মূল্যায়ন ব্যবস্থা একজনকে 'মেধাবী' তকমা দিচ্ছে তাকে যদি আমরা শেষ পর্যন্ত মেনেই নিই, তাহলে কোন যুক্তিতে একজন মেধাবী, ডাক্তারি পড়াকে নিজের মকসদ বানাবে না? আজ বিশ্বায়নের পতাকা যখন আমাদের শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে উড়ছে পতপতিয়ে তখন 'কেরিয়ার' তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত সুখ, বিশ্বায়নের ফসল ঘরে তোলার মাধ্যম মাত্র। আমাদের সমাজে একজন স্কুলপড়ুয়ার নিজের ব্যুৎপত্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী 'কেরিয়ার' নির্বাচনের কোনো ধারণা বর্তমান আছে কি? আর হলপ করে বলতে পারি, প্রতিপত্তি ও টাকার হিসেব অবচেতনে রেখেও যদি একশোটা ছেলে-মেয়ে ডাক্তারি পড়তে ঢোকে, তার মধ্যে আজও অন্তত জনা ষাটেক 'মানুষের সেবা করব'—এই ইচ্ছা নিয়েই ডাক্তারি পড়তে ঢুকছে কিন্তু। (সাড়ে পাঁচ বছর পর সংখ্যাটা ঠিক কী কারণে একে চন্দ্র দু-য়ে পক্ষতে এসে দাঁড়াচ্ছে সেটা পরবর্তী অংশে বোঝার চেষ্টা করব)।

বক্তব্যের দ্বিতীয়াংশে এসে নব্য প্রজন্মের ডাক্তারদের আখ্যানে ফুটে উঠেছে হিপোক্রেটিক শপথ আওড়ানো 'হিপোক্রিটস'দের কথা। মানুষের দুঃখ নিবারণ দূরে থাক, তারা কোরবান শেখকে আরশোলা বানাচ্ছে, পথবাসী ভিক্ষুকের ক্ষত, গরিবের ঘা-কে পাশ কাটিয়ে জীবনের হাইওয়েতে সাফল্যের মার্সিডিজ ওড়াচ্ছেন। হ্যাঁ, এই জায়গায় এসে লেখকের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু এরপরেই আর যুক্তির ধরতাই থাকল না। 'আঠারোর পর মানুষের সামগ্রিক জীবনবোধ, নান্দনিক ধ্যানধারণা খুব একটা পালটায় না . . .'—অভিজিৎবাবু, জীবনকে দেখা, বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝা ও তাতে নিজের অবদান রাখার প্রক্রিয়াটা বরং শুরু হয় আঠারো পেরিয়ে কলেজ চত্বরে এসেই, যাকে খুব সহজ ভাষায় 'রাজনীতি' বলে। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির যে উদাহরণ যুগে যুগে ও দিকে দিকে ক্ষমতাসীন শাসকদল অত্যন্ত ধৈর্য ধরে গড়ে তুলেছে, তাতে উপরোক্ত বক্তব্য শুনেই কোনো প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ কেউ চাপাতি হাতে নিলেও আমার আর কিছু করার নেই। আপনি যে 'সত্তর, আশি এমনকী নব্বই দশকের শুরুতেও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক ন্যায়ের ভাবনায় সম্পৃক্ত হওয়ার প্রবণতা' দেখতে পাওয়ার কথা বলেছেন, তার প্রেক্ষাপট সেই সময়ের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। সমাজে সুস্থ ও উন্নত রাজনীতির কোনো পরিসর থাকবে না আর মেডিক্যাল কলেজে একজন পড়তে এসে টপাটপ 'আর্তমানুষের সেবা'র উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে—এই ভাবনাটা বাতুলতা নয় কি? আপনার মতো 'পুরোনো' ও 'প্রাজ্ঞ'রা নব্য প্রজন্মের ডাক্তারদের তুলোধোনা করবেন অথচ এই কথাটা সুকৌশলে এড়িয়ে যাবেন যে—আর্থসামাজিক কাঠামো, তাতে ডাক্তারের অবস্থান, দায়, ভূমিকা ও কর্তব্যবোধ গঠিত হওয়ার জন্য যে ন্যূনতম রাজনৈতিক পরিমণ্ডল লাগে, বোধের বিকাশের যে ক্ষেত্র লাগে—সেটা খুব দায়িত্ব নিয়েই ধ্বংস করেছে ও করছে পূর্বতন থেকে বর্তমান শাসকশ্রেণি ও তার রাজনীতিই। আজ যিনি ডাক্তারি পড়তে এসে সাড়ে পাঁচবছরে একবারও এই কথাটাই শুনলেন না যে এ দেশে প্রতি সতেরোশো জন মানুষপিছু একজন ডাক্তার, যে ডাক্তারদের আবার দু-তৃতীয়াংশই থাকে শহরে—তিনি কোন মন্ত্রবলে দীক্ষিত হয়ে ডাক্তারি পড়ে উঠে গ্রামে যাবেন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য? তাঁকে কোনো বড়ো ছবি কি দেখানো হচ্ছে গোটা ডাক্তারি পড়ার জীবনটায়? সেক্ষেত্রে তিনি কীভাবে নিজেকে সেই ছবির অংশ করে তুলবেন? আইকিউ মেপে যে শুভবোধের ধারণা পাওয়া যায় না তা আপনিও বিভিন্নভাবে বলেছেন। কিন্তু কীভাবে শুভবোধ জাগ্রত হয়, অন্তত তার বাতাবরণটা তৈরি হয়, সেটা আর বলেননি। ওটা দৈবস্বপ্নে পাওয়া যায় না, আকাশ থেকেও টপকায় না—ওটা বোঝাপড়ার যে পরিমণ্ডলে তৈরি হয় (আপনি তাকে অন্যকিছু নাম দিতে পারেন, আমি তাকে 'ছাত্র রাজনীতি'ই বলব) তাকে সমাজের সমস্ত প্রাজ্ঞ ও পুরোনো হোতারা দেওয়ালে গজাল মেরে গেঁথে শপিং মলে মাসকাবারি করতে বেরিয়েছে, আর খেয়াল পড়লে নব্য প্রজন্মকে গালে ঠোনা মেরে 'দুষ্টু কোথাকার' বলে দিচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির দুর্নিবার রথের চাকায় মানবিক স্বপ্ন দেখার জল-হাওয়া পিষ্ট হয়ে গেলে তো নব্য প্রজন্ম স্বপ্নহীন, দায়হীন হয়েই পড়ে থাকবে এ পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্রে—এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! ডাক্তার তো কোনো ভিনগ্রহবাসী নয়, না?

বক্তব্যের প্রায় শেষাংশে এসে একবার মাত্র 'মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষণ পরিমণ্ডলের' উল্লেখ করেই খুব সুকৌশলে আর ও পথ মাড়াননি লেখক। তার খানিক পরে ফিরে এসে 'পোল্ট্রি'র মুরগিদের সহবত শিখিয়েছেন কীভাবে 'জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে আর তার প্রায়োগিক ব্যুৎপত্তিতে

দক্ষ হয়ে মানুষের মাঝে বেরিয়ে পড়া' যায়। লেখকমশাই, গোটা মেডিক্যাল পড়াশুনোয় চারটে 'এম বি' মিলিয়ে মোট চোদ্দটা বিষয় পড়ানো হয় যার মধ্যে আটখানা বিষয়ই 'নন-ক্লিনিক্যাল'। সেগুলো পড়ানোর সময় খুব কম শিক্ষক-শিক্ষিকাই এমনভাবে পড়ান যাতে মানুষের জীবন, তার শরীর, তার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় এই বিষয়গুলোর কী ভূমিকা তা সম্বন্ধে একজনের আগ্রহ জন্মায়। সিলেবাস আর পরীক্ষা ব্যবস্থাও এমনভাবে তৈরি যাতে আগ্রহ ব্যাপারটাকে বাড়িতে রেখে ক্লাসে আসতে হয় ডাক্তারি পড়ুয়াদের। একজন ডাক্তারি পড়ুয়া রোগের উপসর্গ শিখছে, কোষীয় ও আণবিক স্তরে তার কারণ জানছে, নির্দিষ্ট ওষুধ কীভাবে কাজ করে তা মুখস্ত করছে কিন্তু কোনো রোগীকে ছুঁয়েও দেখছে না, তার সঙ্গে কথা বলাই শিখছে না—এর থেকে অবৈজ্ঞানিক আর কী হতে পারে? এই মুহূর্তে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের একেকটা ব্যাচে দু-শো-আড়াইশো ছাত্রছাত্রী—তারা কীভাবে শবদেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে ব্যবচ্ছেদ করা শিখছে, তারা কীভাবে ওয়ার্ডে ঘুরে একজন রোগীকে ঘিরে ধরে জনা পঞ্চাশেক মিলে 'কেস স্টাডি' শিখছে তার উল্লেখও প্রয়োজন। সর্বোপরি, ডাক্তারি একটি গুরুমুখী বিদ্যা। একটা রোগ সম্বন্ধে আগাপাশতলা জানতে হয়, সেটা নিরাময়ের পদ্ধতি নিখুঁতভাবে শিখতে হয় যেন প্রয়োগক্ষেত্রে ভুল না রয়ে যায়। আজ ক-জন স্যার বা ম্যাডাম ধৈর্য ধরে পড়ে থাকছেন ওয়ার্ডগুলোতে সেই বিদ্যা শেখানোর জন্য? তার কারণ কী—সেই বিতর্কে আর গেলাম না, কিন্তু তার প্রভাব কী সেটা সহজেই অনুমেয়। ডাক্তারি পড়াশোনায় প্রচণ্ড দড় হয়ে পাশকরা ছাত্রটিও ঘরোয়া পদ্ধতিতে ওআরএস বানাতে জানে না, আমদের এই গরিব দেশে অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ওষুধের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার, কোন পরীক্ষা কখন করাব তার বাস্তবসম্মত ধারণাও অস্পষ্ট। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই জন্যই যে সে ডাক্তারি পাশ করেই ছুটবে কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে স্পেশালিস্ট হওয়ার জন্য, তাতে আর আশ্চর্যের কী? আর স্পেশালিস্ট হওয়ার সেই অমানুষিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও তাকে জিজ্ঞেস করা হবে প্রতি দশলক্ষ মানুষে একজনের হয় সেই রোগ ও তার সঙ্গে জড়িত হাজারটা প্রশ্ন। আর সত্যি করে বলুন তো, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল বাদ দিলে আজ ক-টা মানুষ নামের পাশে শুধু এমবিবিএস বসানো ক্বরও কাছে চিকিৎসা নিতে আসছে? তাই সর্বতো অর্থেই এই মুহূর্তে ডাক্তারি পাশকরা একজন বিশেষজ্ঞ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অসহায়। অন্যদিকে, গোটা সিস্টেমকে যন্ত্রনির্ভর বানিয়ে দিয়ে সভ্যতা আশা করবে ডাক্তার শুধুমাত্র গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে দুটো হাত আর পা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে আর্তের দরবারে, আর তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া এক রোগীকে প্রাথমিক সি.টি.স্ক্যানটুকুই করানো দায় হয়ে পড়বে—এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের করণীয় ঠিক কী? ডাক্তারকে তাঁর দায়িত্ব কানে ধরে বোঝানোর লোকের যখন অভাব হচ্ছে না তখন অন্যদিকে কিন্তু প্রতিদিন বোকাবাক্সে গাঁটের ব্যথায় 'এনার্জি ড্রেসলেট' বা ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিজ্ঞাপন বেড়েই চলেছে। এ ব্যাপারে কারোর কোনো দায় নেই? সম্পূর্ণ কবন্ধ এক সিস্টেম তার দাঁত-নখ নিয়ে এক 'মেধাবী'র যোগ্যতাকে অগ্নিসাক্ষী রেখে পরিমাপ করবে হাজারবার আর তারপরে সে অচেনা, জীবনবিমুখ এক ডাক্তারে পরিণত হলে কাঠগড়ায় তুলবে তাকে—এর শেষ হওয়া দরকার বলে মনে হয় না?

একদম শেষে এসে লেখক বলেছেন—দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবনের সমস্যা শোনার ও বোঝার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা যদি চিকিৎসকের না থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্যভাবে 'মানুষের জীবনের সমস্যা' বলা হয়েছে, মানুষের 'শারীরিক সমস্যা'র কথা আলাদা করে বলা হয়নি। সমাজে একশোটা রোগের মধ্যে প্রায় নব্বইখানা রোগই জন্ম নেয় একটা আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও তাতে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর নির্ভর করে। তার প্রাথমিক ধারণা মেডিক্যাল শিক্ষায় যে বিষয়টি থেকে পাওয়া যায় সেই 'কমিউনিটি মেডিসিন' বিষয়টিকে অবশ্য ব্রাত্য করে রেখেছেন কিছু প্রাজ্ঞ ও নীতিবাগীশ লোকেরাই। ফলে ওসব প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব, প্রান্তিক জীবনের চর্চা বা মানবিকতার কথা তোলার পরেও 'মানুষের জীবনের সমস্যা' ও সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়ের সমাধানটা যে শুধুমাত্র ঢাল- তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার ডাক্তারকে দিয়ে হবে না সেটারও উল্লেখ প্রয়োজন। বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কমবে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে জীবনদায়ী ওষুধের দাম, সরকার ভোট টানার জন্য চকচকে প্রোজেক্ট নামাবে আর সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিকটাও পাওয়া যাবে না—এমতাবস্থায় ডাক্তার কোনো মসীহা নয় যে আকাশ থেকে নেমে এসে একা হাতে ভেঙে পড়া মানুষ ও তার স্বপ্নকে নতুন জীবন দেবে। স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার—গোটা সিস্টেমটা সেসব ভুলে দেশের সমগ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থাটাকে বাজার করে দেবে বেসরকারিকরণ করে আর সমস্ত 'মেধাবী' ডাক্তার হঠাৎ এক সকালে জনদরদি হয়ে উঠে আর্তের কুটিরের দাওয়ায় দাওয়ায় পৌঁছে যাবে—এই ভুয়ো স্বপ্ন ফেরি করা বন্ধ হোক।

অ্যাপ্রনের পকেটে, স্টেথোর চেস্টপিসে, স্ফিগমো-ম্যানোমিটারের পারদস্তম্ভে কোন আদর্শ আর মানসিকতা বহন করছি নব্য আমরা। অর্থনৈতিকভাবে নেতিয়ে না পড়েও দিনের শেষে 'মানুষের জন্য' ডাক্তারিটা করাই যায়।

গড়ে ওঠার একটা সামগ্রিক পদ্ধতিতে জোর না দিয়ে, সমাজের খুলে যাওয়া বাকি নাটবোল্টুগুলোর দিকে আঙুল না তুলে শুধু 'ব্যক্তি' ডাক্তারকে কাঠগড়ায় তোলার যে খেলা শুরু হয়েছে এবং তাতে রোগী-ডাক্তার সম্পর্কের যে অবক্ষয় লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে অনুঘটক হয়ে বিশেষ কিছু প্রগতিশীলতার পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে কি?

আর একই সঙ্গে নব্য ডাক্তারদেরও ভেবে দেখতে বলব—অ্যাপ্রনের পকেটে, স্টেথোর চেস্টপিসে, স্ফিগমোম্যানোমিটারের পারদস্তম্ভে কোন আদর্শ আর মানসিকতা বহন করছি নব্য আমরা। অর্থনৈতিকভাবে নেতিয়ে না পড়েও দিনের শেষে 'মানুষের জন্য' ডাক্তারিটা করাই যায়। আমি-আপনি-আমরা সবাই একসঙ্গে নতুন কোনো উদাহরণের জন্ম না দিলে 'আর্ত' জনগণ কোনো কাটমানি খাওয়া, হৃদয়হীন প্রাজ্ঞ ডাক্তারের উদাহরণের ছায়াতেই আমাদেরকে চিনবে কিন্তু। ভেবে দেখবেন...। স্বাস্থ্যের বৃত্ত

ডা. অনীক চক্রবর্তী, এম বি বি এস, একটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যুক্ত আছেন শ্রমজীবী মানুষের জন্য চলা এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

QUALITY is the way of life

PALSONS DRUGS

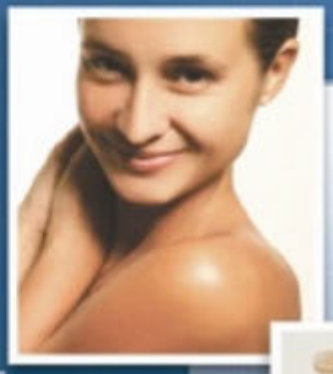

WHO-GMP
Certified Company

ISO 9001:2008
Certified Company

IDMA
Quality Excellence
Award Winner

PALSONS DRUGS International Tie-ups
For Indian Market

Belgium — AURIGA

France — BIODERMA

Spain — Aesthetic Dermal

Spain — SKINTECH

PALSONS DRUGS PVT. LTD.
10/D/1, Ho-Chi-Minh Sarani
Kolkata - 700 071
Phone : 91-33-2282-3776/4277/4278
E-Mail : brandinfo@palsonsdrugs.com

www.palsonsdrugs.com

PALSONS DRUGS

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

২ ডিসেম্বর, ২০১২। এবিপি আনন্দের সাংবাদিক-অ্যাঙ্কর সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা যান উত্তর কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে, ১০ ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করার পর। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে। তাঁর এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি ছিল। যে চিকিৎসকেরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরা কেউই ধরতে পারেননি, তাঁর যন্ত্রণার কারণ। আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়েছিল অনেক দেরিতে। স্রেফ ভুল চিকিৎসা এবং অবহেলায় এই অকালমৃত্যুর পর সন্দীপ্তার শুভানুধ্যায়ীদের মনে হয়েছিল, কিছু করার দরকার। এমন কিছু, যা নিজের শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করবে মেয়েদের এবং তাঁদের পরিবারকে। এমন কিছু, যা মনে করাবে একবিংশ শতকের কলকাতা শহরে চিকিৎসার গাফিলতিতে অকাল মৃত্যু ঘটেছিল এক নবীন সাংবাদিকের, যিনি অন্যের জন্য করতে জানতেন। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ এবং *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনায় স্থির হয়, মেয়েদের এবং তাঁদের পরিবারকে স্বাস্থ্যসচেতন করতে কিছু কর্মসূচি নেওয়া হবে। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ বিভিন্ন জেলায় স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির করবে, সেই সঙ্গে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে মেয়েদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু লেখা, তুলে ধরা হবে কিছু বিতর্ককেও। গত দু-বছর ধরে আয়োজিত হয়েছে সন্দীপ্তা স্মারক বক্তৃতাও।

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

এক মডেল যা প্রমাণ করে
কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা করা সম্ভবপর।
ক্লিনিক চেঙ্গাইল-বেলতলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

সাধারণ চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, স্ত্রীরোগ, মনোরোগ, চর্মরোগ, দন্তরোগ, চক্ষুরোগ,

ফিজিকাল মেডিসিন, ফিজিওথেরাপি, ডায়াবেটিক ক্লিনিক,
শেখার অসুবিধা আছে এমন শিশুদের ক্লিনিক, মানস-মন্দিত শিশুদের ক্লিনিক।

কম খরচে

প্যাথোলজি, এক্স-রে, ইসিজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, স্পাইরোমেট্রি।

সরকারি হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের
চেয়েও কম দামে ওষুধের দোকান।

যোগাযোগ ০৩৩-৬৪৫৩১৮২১, ০৩৩-৩২২১৫৬২৮

ওয়েব সাইট www.shramajibiswasthya.org

পরিচালনায়

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি

একটি মেয়ের জীবন আচমকা কেড়ে নিতে পারে এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি; একটু সতর্ক হলে তবেই এর থেকে বাঁচা যায়—লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি।**

বয়স ২৪ বা ২৫। এক আপাত-সুস্থ তরুণী। অধুনা বিবাহিতা। নামটা ধরে নিন সুদীপা। রোববার সকালে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করে অসহ্য পেট ব্যথা শুরু হল। মাথা কেমন ঘুরতে লাগল। বাড়ির লোকজন তাড়াহুড়ো করে কাছাকাছি নার্সিং হোমে নিয়ে গেলেন। সেখানকার ছোটো ডাক্তার, রেসিডেনশিয়াল মেডিক্যাল অফিসার (RMO) সাহেব গ্যাসের ব্যথার নিদান দিলেন। বাড়ির লোকের অনুরোধে ভর্তিও করলেন। আরএমও মানুষটি ভালো। কর্তব্যনিষ্ঠ। একটি আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবস্থাও করলেন। তবে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ তৎক্ষণাৎ পাওয়া গেল না। আরএমও দেখভাল করলে কী হবে, নার্সিং হোম রোগী ভর্তি করে কোনো বড়ো ডাক্তারের নামে। যে সিনিয়র ডাক্তারের অধীনে সুদীপাকে ভর্তি করা হয়েছিল তিনি তখন শহরের বাইরে। বুঝছেন না কেন, রোববার তো। ছুটির দিনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া কি অত সোজা? হলেই বা সে মহানগরী কলকাতা। ইতিমধ্যে সুদীপার পেট ব্যথা বাড়ল। সারা শরীর ঘামতে শুরু করল। রক্তচাপ নামতে থাকল। ফর্সা রং আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হতে থাকল। বুদ্ধিমতী সুদীপা কিন্তু বিপদের গন্ধ পেয়েছিল। সেই কাতর অবস্থাতেও সে বারবার বলল, কিছু করুন একটা কিছু করুন আপনারা। আরএমও সাধ্যমতো চেষ্টা চালালেন; স্যালাইন, অক্সিজেন সবই লাগানো হল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। তখন আর সিনিয়র চিকিৎসক এসেও কিছু করতে পারলেন না। একটি ফুলের মতো প্রাণ অকালে ঝরে গেল। মৃত্যুর কারণ এক্টোপিক প্রেগন্যান্সিজনিত রক্তক্ষরণ। এই মৃত্যু কি এড়ানো যেত? অবশ্যই যেত। তবে রোগ নির্ধারণ সঠিক সময়ে হওয়া দরকার। আর সে ব্যাপারে রোগী বা তাঁর আত্মীয়স্বজনের সচেতনতা বাড়াতেই এই সংক্ষিপ্ত রচনা।

এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি কী?

আমরা জানি, মায়ের পেটের তলার দিকে একটা মাংসের থলি থাকে, তার নাম জরায়ু, তার মধ্যে শিশু আস্তে আস্তে বড়ো হয়। সেই জরায়ুর গহ্বরের বাইরে গর্ভসঞ্চারের অপর নাম এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি (Ectopic Pregnancy)। পরের পৃষ্ঠার ছবিটি দেখলে বুঝতে পারবেন জরায়ুর সঙ্গে কীভাবে দু-টি ডিম্বনালী ও ডিম্বাশয় যুক্ত। সাধারণভাবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন (নিষেক) হয় ডিম্বনালীতে (Fallopioan tube)। নিষিক্ত ডিম্বাণু তারপর চলে আসে জরায়ু-গহ্বরে এবং পরিপুষ্ট হয় ভ্রূণের আকারে। কোনো কারণে যদি নিষিক্ত ডিম্বাণু ডিম্বনালীতেই থেকে যায় তাহলে সেই অবস্থাকে আমরা বলি এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি; আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সংক্ষেপে বলি এক্টোপিক। যদিও এদের সংখ্যা যথেষ্ট কম (মোট গর্ভসঞ্চারের ১-২%), ব্যাপারটা কিন্তু ভয়ংকর। ডিম্বনালীর স্বল্প পরিসরে বাড়তে না পেরে হামেশাই এরা ডিম্বনালী ফাটিয়ে দেয় এবং পেটের মধ্যে বিপজ্জনক রক্তক্ষরণ ঘটায়। যেমনটি সুদীপার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

উপসর্গ

বেশির ভাগ সময়েই এক্টোপিক-এর লক্ষণ বোঝা যায় গর্ভাবস্থার ৬ থেকে ১০ সপ্তাহে। অর্থাৎ মাসিকের রক্তক্ষরণ সময়ে না হয়ে পিছিয়ে যাবার পর। রোগের উপস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে একটু আলাদা রকমের হতে পারে, তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রোগিণী আসে তলপেটে ব্যথা নিয়ে।

যোনিদ্বার দিয়ে সামান্য পরিমাণে রক্তপাত থাকলেও থাকতে পারে। তবে সেটাকে বিলম্বিত মাসিক ঋতুস্রাব ভেবে ঠকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কখনো কখনো ডাক্তারের কাছে আসার কারণ হয় কাঁধে বা পিঠে ব্যথা অথবা পেট খারাপের লক্ষণ নিয়ে—যেমন ডাইরিয়া বা কোষ্ঠত্যাগে ব্যথা। তবে হঠাৎ করে তলপেটে অসহ্য ব্যথা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, পিঠে ব্যথা, রক্তচাপ কমে যাওয়া ইত্যাদি হলে পেটের মধ্যে বড়োসড়ো রকমের রক্তপাত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তারি ইমার্জেন্সি।

এক্টোপিক-এর লক্ষণ

- পিরিয়ড পিছিয়ে যাওয়া
- তলপেটে ব্যথা
- পিঠে বা কাঁধে ব্যথা
- ডাইরিয়া
- হঠাৎ করে প্রচণ্ড ব্যথা
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন?

পিরিয়ড পিছিয়ে গেলে একটি প্রস্রাব নিয়ে গর্ভধারণ পরীক্ষা (Urine Pregnancy Test) করুন। বাড়িতে নিজেই করতে পারেন। প্রায় সব ওষুধের দোকানেই এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (Kit) পাওয়া যায়। টেস্ট যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা কম। আর টেস্ট যদি পজিটিভ হয় এবং তলপেটে ব্যথা থাকে তাহলে সত্বর ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বলাই বাহুল্য হঠাৎ করে অসহ্য পেট ব্যথা বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার মতো ভয়ানক কিছু হলে দেরি না করে সরাসরি নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রের জরুরি বিভাগে হাজির হোন।

এক্টোপিক প্রেগন্যান্সির সম্ভাবনা বাড়ে কীসে? (Risk Factors)

যৌনজীবন যাপন করেন এমন যেকোনো মহিলারই এক্টোপিক হতে পারে। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা বেশি।

ঝুঁকি বাড়ে

- আগে একটা এক্টোপিক হয়ে থাকলে
- ডিম্বনালীতে সংক্রমণ বা সার্জারি হয়ে থাকলে
- জরায়ুতে কপার-টি জাতীয় জন্মনিরোধক থাকা অবস্থায় গর্ভসঞ্চার হলে
- আই ভি এফ ইত্যাদি ডাক্তারি প্রক্রিয়ায় গর্ভসঞ্চারের ক্ষেত্রে
- বয়স ৪০-এর বেশি হলে
- ধূমপায়ী হলে

রোগ নির্ধারণ

স্বাভাবিক গর্ভধারণ, মিসক্যারেজ ও এক্টোপিক প্রেগন্যান্সির লক্ষণ ও উপসর্গের মধ্যে অনেকটা মিল থাকে। তাই এক এক সময় রোগ নির্ধারণে অসুবিধা হতে পারে। আমাদের চিকিৎসক শিক্ষক-শিক্ষিকারা একটা কথা প্রায়ই বলেন ''বেশি করে সন্দেহ করবে''—(High Index of Suspicion)। অর্থাৎ চিকিৎসকের সন্দেহপ্রবণ মন থাকতে হবে। ''অন্য কিছু প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত এক্টোপিক হয়েছে—এমন ভাবতে থাকবে।'' রোগী হিসাবে বা

''অন্য কিছু প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত এক্টোপিক হয়েছে—এমন ভাবতে থাকবে।''

রোগীর আত্মীয়-বন্ধু হিসাবে একটি অত্যন্ত সাধারণ প্রস্রাব নিয়ে গর্ভনির্ধারণ পরীক্ষা করিয়ে আপনারা প্রভূত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারেন।

চিকিৎসকেরা এক্টোপিক ধরার জন্য রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা ছাড়াও সাধারণত যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করে থাকেন সেগুলো হল: আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, বিটা এইচ সি জি মাপার রক্তপরীক্ষা, ও ল্যাপারোস্কোপি। খুব প্রাথমিক অবস্থায় এগুলোর কোনোটিই সুনির্দিষ্টভাবে এক্টোপিক ধরতে সক্ষম না-ও হতে পারে। এই অবস্থায় নীতি হল ''অন্য কিছু প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত এক্টোপিক হয়েছে এমন ভাবতে থাকবে।'' শার্লক হোমস্-এর মতো শোনাচ্ছে তাই না?

চিকিৎসা

মূল উদ্দেশ্য হল মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষা। পরিস্থিতি বিচারে মূলত তিনটি পন্থা নেওয়া হয়। অপেক্ষা করা ও দেখা (wait and see), মেডিক্যাল এবং সার্জিক্যাল। এই সিদ্ধান্ত নিজে নিতে যাবেন না। একজন অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল চিকিৎসক নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে এই সব পন্থার ভালোমন্দ আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করা যায়।

চিকিৎসা-সিদ্ধান্ত নির্ভর করে

- রোগ লক্ষণ ও উপসর্গ কতটা প্রবল
- সাধারণ স্বাস্থ্য
- রক্তে বিটা এইচ সিজি হরমোনের মাত্রা
- আলট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট
- পেটের ভিতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা
- স্থানীয় হাসপাতাল/নার্সিং হোমে কতটা কী ব্যবস্থা আছে।

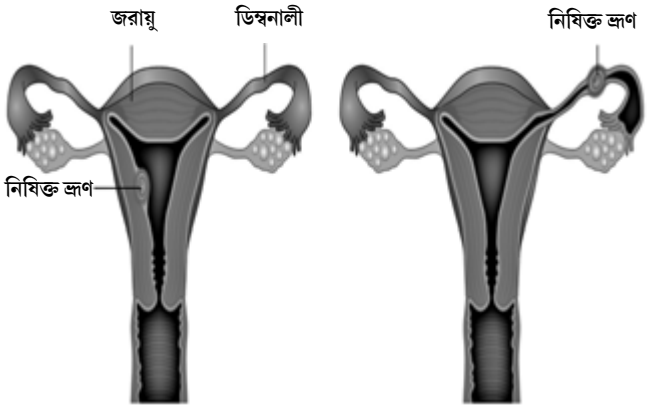

চিত্র ১. স্বাভাবিক প্রেগন্যান্সি ডিম্বনালীতে এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি

রোগীর পরিস্থিত স্থিতিশীল থাকলে, পেটের ভিতরে রক্তক্ষরণ না থাকলে এবং বিটা এইচ সি জি হরমোন ক্রমশ কমতে থাকলে কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই রোগীকে শুধুমাত্র চিকিৎসকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা যেতে পারে। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলা হয় কনজারভেটিভ চিকিৎসা (Conservative treatment)। আরও চলতি কথায় অপেক্ষা করা ও দেখা (wait and see)। পরিস্থিতি স্থিতিশীল, রক্তক্ষরণ নেই কিন্তু রক্তে বিটা এইচ সি জি-র পরিমাণ যথেষ্ট বা আস্তে আস্তে কমছে না, এই অবস্থায় কিছু ইঞ্জেকশন দিয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণ ইত্যাদিকে নষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতি সময়-সাপেক্ষ, কিন্তু ব্যয়বহুল নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই পদ্ধতি সফল হলে রোগীকে ডিম্বনালী (Follopian tube) হারাতে হয় না বা বড়ো অপারেশনে যেতে হয় না। তবে এই ধরনের চিকিৎসা চলাকালীন চিকিৎসককে কিছুকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষা (মনিটরিং) এবং বিরল ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সার্জারির দরকার হতে পারে।

রক্তক্ষরণ হচ্ছে বা হতে পারে, প্রাণের আশঙ্কা আছে, রোগীর অবস্থা উদ্বেগজনক এসব ক্ষেত্রে সার্জারি বা অপারেশন করা হয়। ল্যাপারোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে ছোটো করে কেটে অপারেশন হতে পারে, বা বড়ো করে পেট কাটার দরকার হতে পারে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে ডিম্বনালীতে ভ্রূণটি আছে সেটি বাদ দেওয়া হয়। এর ফলে রক্তপাত তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা যায়। তবে এই চিকিৎসা করতে গেলে রোগীকে অজ্ঞান করতে হয় এবং বড়ো সার্জারি করার মতো পরিকাঠামো থাকতে হয়।

পরবর্তীকালে গর্ভধারণে সমস্যা হবে কি?

বেশিরভাগ মহিলার ক্ষেত্রেই জীবনে একবার মাত্র এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি হয় এবং ভবিষ্যতে মাতৃত্বের সম্ভাবনা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। অপারেশনের ফলে একটি ডিম্বনালী হারালেও ভবিষ্যতে সফল গর্ভধারণের সম্ভাবনা খুব একটা কমে না। পরের কোনো একবার এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি হবার সম্ভাবনা অবশ্য থাকে—সেটা অল্পই। তবে এটা নির্ভর করে আপনার প্রথমবার কী ধরনের চিকিৎসা হয়েছে এবং যে ডিম্বনালীটা ঠিক আছে, সেটার অবস্থার ওপর। পরবর্তীকালে গর্ভধারণ করলে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে ভ্রূণের অবস্থান দেখে নেওয়া ভালো।

দূরের বন্ধুদের জন্য

যে সমস্ত চিকিৎসাকর্মী, সচেতন রোগী বা আত্মীয়বর্গ শহরাঞ্চল তথাকথিত আধুনিক পরিকাঠামোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাঁদের জন্য দু-এক কথা। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই প্রস্রাব-নমুনা নিয়ে গর্ভধারণ পরীক্ষা (প্রেগন্যান্সি টেস্ট) করান। এটি অত্যন্ত সহজ এবং কম খরচের একটি পরীক্ষা। সামান্য শিক্ষিতা রোগী বাড়িতে বসে নিজেই হয়তো করতে পারবেন। টেস্ট পজিটিভ হলে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। টেস্ট নেগেটিভ হবার অর্থ বিটা এইচ সি জি হরমোনের মাত্রা শূন্য বা অত্যন্ত কম। সেক্ষেত্রে রোগী গর্ভবতী নন বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। আর তর্কের খাতিরে যদি তাঁকে সদ্য-গর্ভবতী বলে ধরে নিই, তাহলেও প্রাণনাশের সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম। এই পরিস্থিতির কয়েকদিন পর প্রস্রাব-নমুনায় ওই পরীক্ষা আবার করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলে গর্ভধারণ তথা এক্টোপিক প্রেগন্যান্সির সম্ভাবনা নেই বলা যায়।

যে সমস্ত চিকিৎসাকর্মী, সচেতন রোগী বা আত্মীয়বর্গ শহরাঞ্চল তথাকথিত আধুনিক পরিকাঠামোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাঁদের জন্য দু-এক কথা। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই প্রস্রাব-নমুনা নিয়ে গর্ভধারণ পরীক্ষা (প্রেগন্যান্সি টেস্ট) করান।

শেষের কথা

এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি আপনাকে মেরে ফেলতে পারে। বাঁচার উপায় হল দ্রুত রোগটা নির্ণয় করা, আর সময়মতো ঠিকঠাক হস্তক্ষেপ করা। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা আর চিকিৎসকের এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি কিনা এই সন্দেহ সবসময় জাগ্রত থাকা—এই দুটো হলে হয়তো আমরা অনেক সুদীপাকে বাঁচাতে পারব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এফআরসিওজি, একজন স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী বিদ্যা বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

Advt.

অনীক

অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

Advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

জরায়ু নেমে যাওয়া

ইংরাজিতে বলে ইউটেরাইন প্রোলাপ্‌স। যোনিদ্বার দিয়ে জরায়ু নীচের দিকে নেমে যেতে চায়। সমস্যা খুব কঠিন হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা লজ্জায় কথাটা কাউকে বলেন না, আর তাতে কষ্ট বাড়ে, রোগ বাড়ে, অপারেশন না করে রোগ সারানো যায় না। কিন্তু এটা আটকানো সম্ভব, লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

নারীদের নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে জরায়ু নেমে যাওয়া অন্যতম, যা ভুক্তভোগী নারী লজ্জার কারণে কাউকে বলতে পারেন না। এই সমস্যা যতদিন পর্যন্ত জটিল ও অসহনীয় পর্যায়ে না পৌঁছোয় ততদিন তিনি এই যন্ত্রণা একাকী নীরবে সহ্য করেন। এই রোগী অধিকাংশই গরিব, অবহেলিত, তাই বেশিরভাগ রোগীই জানেন না যে এই সমস্যার সমাধান আছে। তাঁরা এটাকে দুর্ভাগ্য হিসেবে মেনে নেন।

জরায়ু নেমে যাওয়া কী?

জরায়ু (সন্তান ঘর, ইউটেরাস) একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা নারীদেহের তলপেটের ভেতরে মাংসপেশি ও লিগামেন্ট দিয়ে সংযুক্ত থাকে। সাধারণ অবস্থায় জরায়ুর আকার হাতের মুঠির সমান হয়। জরায়ুতে যখন বাচ্চা আসে তখন তা আকারে ও ওজনে বহুগুণ বেড়ে যায়। এ সময় জরায়ুর মাংসপেশি ও লিগামেন্ট যদি জরায়ুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী না হয়ে ওঠে, তাহলে এই সব পেশি ও লিগামেন্ট ছিঁড়ে যেতে পারে বা ঢিলে হয়ে যেতে পারে। কোনো কারণে এগুলো ঢিলে অথবা দুর্বল হয়ে গেলে জরায়ু পেটের ভেতরে আর সঠিকভাবে আটকানো থাকে না। ফলে তা যোনিপথের দিকে ঝুলে পড়ে এমনকী যোনির বাইরে ডিমের মতো বের হয়ে আসে। একেই বলে জরায়ু নেমে যাওয়া। জরায়ু নেমে যাবার জন্য সব সময় শরীরে কষ্ট হয়। কোমর ব্যথা, তলপেটে ব্যথা, প্রস্রাব-পায়খানা করতে কষ্ট, ঘনঘন প্রস্রাব ও এবং অত্যধিক সাদাস্রাব নির্গত হওয়া। জরায়ু নেমে গেলে হাঁটতে ও বসতে সমস্যা হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহবাসে কষ্ট হয়। জরায়ু নেমে এসে যদি দীর্ঘদিন যোনিপথের বাইরে থাকে, তাহলে সেখানে ঘা হয়, দুর্গন্ধযুক্তস্রাব বা রক্ত বের হয়। সময়মতো চিকিৎসা করা না হলে এ সমস্যা থেকে ক্যান্সার হতে পারে।

জরায়ু নেমে যাওয়ার লক্ষণ

রোগীর সব সময় মনে হয় যোনিপথ দিয়ে কিছু একটা বের হয়ে আসছে। তলপেট ভার ভার লাগে, মনে হয় নীচের দিকে চাপ পড়ছে। এছাড়া পায়খানা করতে কষ্ট হতে পারে এবং জরায়ু বেশি নেমে গেলে পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় চাপ দিলে ভেতর থেকে লালচে একটা আস্ত ডিমের মতো যোনিপথে নেমে আসে। শোয়া অবস্থায় এই লক্ষণগুলো অনেক কমে যায়।

জরায়ু নেমে যাওয়ার কারণ

অপুষ্টি ও ঘন ঘন বাচ্চা হওয়া হল প্রধান কারণ। অল্প বয়সে বাচ্চা হলে, ঘনঘন বাচ্চা হলে, গর্ভাবস্থায় ভারী কাজ করলে, গর্ভাবস্থায় ভারী জিনিস বহন করলে জরায়ু নেমে আসার সম্ভাবনা বাড়ে। মায়ের দারিদ্র ও অশিক্ষার সঙ্গে এগুলো জড়িত। তার ওপর, পুষ্টির অভাবে জরায়ুকে ঠিক জায়গায়

চিত্র ১. যোনিদ্বার দিয়ে জরায়ুমুখ বাইরে এসেছে

ধরে রাখার পেশি ও লিগামেন্টগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে বাচ্চা হবার চাপ জরায়ু ঠিকভাবে সহ্য করতে পারে না। এ ছাড়া বাচ্চা প্রসবের সময় জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খোলার আগে যদি বাচ্চা বের করার জন্য মা বার বার নীচের দিকে চাপ দেয়, বাইরে থেকে দাই বা অন্য কেউ পেটে জোরে চাপ দিয়ে বাচ্চা বের করার চেষ্টা করে, তাহলেও জরায়ু নেমে আসার সম্ভাবনা বাড়ে। যদি বাচ্চা বের হতে অনেক সময় লাগে, প্রসবের পর গর্ভফুল বের করার জন্য পেটে বেশি জোরে চাপ দেয়া হয় বা ফুল ধরে জোরে টানাটানি করা হয়, সেই চাপ ও টানে জরায়ু নেমে যেতে পারে। প্রসবের পরে কিছু কিছু কারণে জরায়ু নেমে আসার সম্ভাবনা বাড়ে; যেমন প্রসবের পর অনেকদিন পর্যন্ত কষা পায়খানা বা কাশি থাকলে, প্রসবের পরবর্তী সময়ে ভারী কাজ করলে, ভারী জিনিস তুললে বা বহন করলে জরায়ু নেমে যায়। এ ছাড়াও বয়স বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশি দুর্বল হয়ে পড়লে এটা ঘটতে পারে।

জরায়ু যেন না নেমে যায়, সে বিষয়ে করণীয়

যথাযথ পুষ্টি ও শরীরচর্চা ছাড়া প্রধান করণীয় হল—
অল্প বয়সে বা বেশি বয়সে গর্ভধারণ না করা; প্রসবের সময় জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খোলার পর চাপ দেয়া এবং ফুল বের করার সময় কোনোরকম জোর না করা; গর্ভাবস্থায় ভারী জিনিস তোলা বা বহন না করা; ঘন ঘন গর্ভধারণ না করা। এ ছাড়া বেশিদিন পায়খানা কষা বা বেশিদিন ধরে কাশি যেন না থাকে সেজন্য চিকিৎসা করা; বিশেষ করে বেশি করে জল খাওয়া এবং প্রচুর শাকসবজি খাওয়া যাতে পায়খানা কষা না হয়।

ব্যায়াম করে তলপেট ও যোনি অঞ্চলের মাংসপেশি সবল করতে হবে, ও বিশেষত প্রসবের পরবর্তী সময়ে যোনি অঞ্চলের মাংসপেশির ব্যায়াম করাতে হবে।

ব্যায়াম কেন করতে হবে?

প্রসবের পর মাংসপেশি ঢিলে হয়ে যায়, ফলে তলপেটের ভেতরের অঙ্গসমূহ মাংসপেশির ওপরে চাপ দেয়। সেজন্য মাংসপেশি ঠিকমতো সংকুচিত হয়ে আগের অবস্থায় ফেরত যেতে পারে না। মাংসপেশিকে সঠিক অবস্থানে আনার জন্য ব্যায়াম করতে হবে। এই ব্যায়াম করা সহজ।

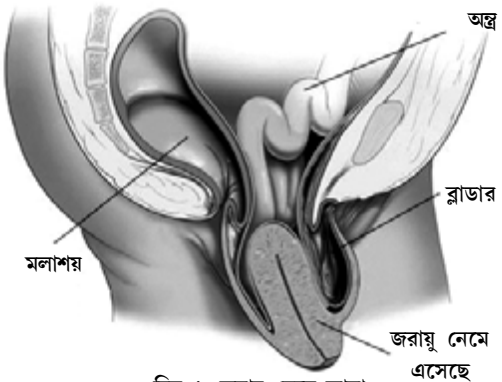

চিত্র ২. জরায়ু নেমে আসা

ব্যায়ামের নিয়মাবলি

- পায়খানা করা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মলদ্বারের মাংসপেশি যেভাবে সংকুচিত হয়, সেভাবে যোনির মাংসপেশিকে সংকুচিত করে ছেড়ে দিতে হবে।
- প্রস্রাবের আগে ১-১০ পর্যন্ত গুণে প্রস্রাব করা শুরু করতে হবে। এবং কিছুক্ষণ প্রস্রাব করার পর প্রসাব বন্ধ করে রেখে ১-১০ পর্যন্ত গুণে আবার প্রস্রাব করতে হবে।

কতবার ব্যায়াম দরকার?

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বাধিক ৫০ বার যোনির মাংসপেশি সংকুচিত ও প্রসারিত করা যাবে। প্রতি পর্যায়ে ১০ বার, এইভাবে দিনে ৪-৫ পর্যায়ে আলাদা আলাদাভাবে যথেষ্ট সময় দিয়ে এই ব্যায়াম করা উচিত। প্রতিবার ব্যায়ামের সময় মাংসপেশি সংকুচিত করে ১-১০ পর্যন্ত গুনে ছেড়ে দিতে হবে, ব্যায়াম করার সময় নিশ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে হবে।

ব্যায়াম করতে করতে যখন মনে হবে মাংসপেশি মোটামুটি শক্ত হয়েছে, তখন এত রুটিন মেনে ব্যায়াম না করলেও চলবে। এটা একটা অভ্যাসের মতো করতে হবে, আর শুয়ে-বসে দাঁড়িয়ে এই ব্যায়াম করা যাবে।

যোনিপথের ব্যায়ামের সুফল

প্রসব পরবর্তী সময়ে নিয়মিতভাবে ৩-৪ মাস এই ব্যায়াম করলে জরায়ু ও যোনিপথের মাংসপেশি শক্তিশালী হয় এবং আগের অবস্থানে ফেরত আসে। এমনকী যাদের জরায়ু অল্প নেমেছে এবং যাদের প্রস্রাব অল্প চাপে বের হয়ে যায়, তারা এই ব্যায়াম নিয়মিত করলে এই সমস্যা কমে যাবে। অবশ্য ৩-৪ মাস ব্যায়াম করার পর যাদের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তাদের এই বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রিং পেসারী পরতে হবে। সব মহিলার এই ব্যায়াম করা উচিত। এতে জরায়ুর মাংসপেশি শক্তিশালী থাকবে এবং জরায়ুর নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

কখন জরায়ুর অপারেশন প্রয়োজন

জরায়ু নেমে বের হয়ে হাঁসের ডিমের মতো বা তার চেয়ে বড়ো হলে, প্রস্রাব-পায়খানা করতে সমস্যা হলে, ক্ষত বা ঘা হলে, সাদাস্রাব অথবা রক্ত যেতে থাকলে; তখন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অপারেশন করতে হবে। অপারেশনের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে পুরো মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বাংলাদেশে মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মরত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রচার পুস্তিকা থেকে কিছু পরিবর্তন করে লেখাটা ছাপা হয়েছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি ক্লিনিকে পুরো সময়ের চিকিৎসক

Advt.

With Best compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

অসুরক্ষিত গর্ভপাত

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়

বছর ষোলোর মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। রাতারাতি নিখোঁজ হয়েছে এমন অবশ্য নয়। বাড়ির লোকেদের কিছুদিন ধরেই সতর্ক করছিল, সে বিয়ে করতে চায়। মেনে নিলে ভালো না মানলে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছাড়বে সে। পরের বাড়িতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সংসার চালানো তার মা এই হুঁশিয়ারি ঠিক হজম করতে পারেননি। ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছিলেন। তার জেরে ঘর ছাড়া সেই মেয়ে।

বিষয়টা জানতাম। প্রাথমিকভাবে এ নিয়ে কিছু উদ্বেগও তৈরি হয়েছিল। তারপর আর পাঁচটা কাজে সেটা ভুলেও গিয়েছি। আবার মনে পড়ল, যখন মাস কয়েক পরে বাড়ি ফিরল সেই মেয়ে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। তার সেই প্রেমিক রাতারাতি উধাও। এ বার ওই কিশোরী মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবেন, কী করবেন সেই মা? উত্তর কলকাতার গলি, তস্য গলি পেরিয়ে এক প্রায়ান্ধকার ঘরে এক ক্লিনিকের সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁরই এক প্রতিবেশী। সেখানেই মেয়ের গর্ভপাতের ব্যবস্থা হল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং সংক্রমণের জেরে তার তিন দিনের মধ্যে মেয়েটির মৃত্যু হল। খাস কলকাতা শহরে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সমস্ত দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে নষ্ট হয়ে গেল একটা জীবন।

ঠিক যেভাবে এই দশকে দাঁড়িয়ে এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি কীভাবে খাস কলকাতা শহরে কোনো মেয়ের মৃত্যুর কারণ হতে পারে তা ভেবে অবাক হয়ে যান চিকিৎসকেরা, ঠিক সেভাবেই এ দেশে আইনসিদ্ধ হওয়ার এত বছর পরে গর্ভপাত কীভাবে কেড়ে নিতে পারে হাজার হাজার জীবন, সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি বা সংক্ষেপে এমটিপি নিয়ে আলোচনা তো কম হয় না। কিন্তু তার পরেও অবাঞ্ছিত মাতৃত্বকে ঘিরে মেয়েদের যন্ত্রণা, হয়রানির শেষ নেই। কাগজে-কলমে এ নিয়ে সরকার, চিকিৎসক সংগঠন, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মহিলা কমিশনসহ বিভিন্ন মহলে অনেক দাবি, অনেক আলাপ-আলোচনার এই খাতে প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে বহু অর্থ। কিন্তু তার পরেও ছবিটা অপরিবর্তিত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-ও জানাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রতি ৮ মিনিটে অসুরক্ষিত গর্ভপাতের কারণে একজন করে মহিলার মৃত্যু হচ্ছে। জরায়ু ফুটো হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, মূত্রনালীতে ক্ষত, শক এবং মৃত্যু—অসুরক্ষিত গর্ভপাতের মৃত্যুর ধারাটা অনেকটা এরকমই।

এ রাজ্যের কথাই ধরা যাক। মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে এ রাজ্যে এত বড়াই, এত দাবি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সমীক্ষাতেই জানা যাচ্ছে এ রাজ্যে কিশোরী ও তরুণী মেয়েদের মৃত্যুর একটা অন্যতম বড়ো কারণ অসুরক্ষিত গর্ভপাত। ২০০৬-২০০৭-এ রাজ্যে এমটিপি-র সংখ্যা ছিল ৪৭০০৫। আর ২০১০-২০১১-তে সেটা বেড়ে হয়েছে ৫৮৭৭৪। এর মধ্যে ১২ থেকে ১৫ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে গর্ভপাতের দিন বা সেই সংক্রান্ত জটিলতায় তার দিন কয়েকের মধ্যে। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের এই হিসেবটাকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ এখানে তাঁদের কথাই উঠে এসেছে, যাঁরা কোনো সরকারি বা সরকার স্বীকৃত কেন্দ্রে গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। তার বাইরে আক্ষরিক অর্থেই ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ক্লিনিক এবং সেখানকার মৃত্যু মিছিলের কথা এখানে উঠে আসেনি।

গ্রামে এই কাজ করেন মূলত প্রশিক্ষণহীন কিছু মানুষ, যাঁরা হাতুড়ে ডাক্তার হিসেবে পরিচিত। যে পরিবেশে, যে সরঞ্জামের সাহায্যে, যতটা অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এটা ঘটানো হয়, তাতে মৃত্যু হার ১০০ শতাংশ হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকত না। যেকোনো সরকারি হাসপাতালে গেলে এ পরিষেবা পাওয়া সম্ভব। তাহলে সেখানে কেন মেয়েটিকে নিয়ে যান না পরিবারের লোকেরা? প্রধান কারণ, গোপনীয়তা। ভিড়ে ঠাসা সরকারি হাসপাতালে আর পাঁচজন চেনাজানা মানুষের সামনে তাঁরা এই 'লজ্জা'র কথা তুলে ধরতে চান না। এজন্য অন্ধকারকেই স্বাগত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের তরফে গোপনীয়তার এই চেষ্টাই মেয়েটির জীবনে যাবতীয় ঝুঁকি ডেকে আনে। চেনা ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে না, নামি ক্লিনিকে গেলে লোক জানাজানি হয়ে যেতে পারে। তাই এমন কোনো জায়গায় যাওয়া হয় যা সব দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর, অবৈজ্ঞানিক। এইসব জায়গায় শুধু প্রশিক্ষণহীন কর্মীরা কাজটা করেন তা নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকগুলিও স্বীকৃত নয়।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের তরফে এই প্রবণতা বন্ধ করতে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা বিশেষ এগোয়নি। ফলে এখনও গ্রামে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের মৃত্যুর কারণ। শুধু গ্রামেই বা বলছি কেন। এক স্ত্রী-রোগ চিকিৎসক দিন কয়েক আগেই বলছিলেন, কলকাতার এক স্বীকৃত ক্লিনিকের পারফরম্যান্সের কথা। তাঁর কথায় ''আমি আকছার এমন কেস পাচ্ছি, যেখানে অ্যাবরশনের দু-তিন মাস পর জানা যাচ্ছে, সবটা নির্মূল হয়নি। এটা যে সব দিক থেকে কত বিপজ্জনক তা কাকে বোঝাব? ফের অস্ত্রোপচার করতে হচ্ছে। এই সব ক্লিনিক বহু ক্ষেত্রেই নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করে না। পরবর্তী সময়ে কী করা দরকার, অ্যাবরশনের কত দিন পরে ফের একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করে নিশ্চিত হওয়া জরুরি, সে সব এঁরা বুঝিয়ে বলেন না। ফলে সমস্যা বাড়তেই থাকে।''

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-ও জানাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রতি ৮ মিনিটে অসুরক্ষিত গর্ভপাতের কারণে একজন করে মহিলার মৃত্যু হচ্ছে। জরায়ু ফুটো হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, মূত্রনালীতে ক্ষত, শক এবং মৃত্যু—অসুরক্ষিত গর্ভপাতের মৃত্যুর ধারাটা অনেকটা এরকমই। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে গর্ভপাতের বেশ কিছুদিন পরে জানা যায়, ভ্রূণটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। ভিতরে তার অনেকটাই থেকে গিয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই মূত্র পরীক্ষায় ওই

ভ্রূণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। পরে যখন তা জানা যায় তখন হয় সংক্রমণ গভীর আকার নিয়েছে, নয় তো এমন কোনো শারীরিক জটিলতা দেখা দিয়েছে যা সারানো কার্যত অসম্ভব এবং যার পরিণাম মারাত্মক। এই সব মৃত্যুর অধিকাংশই নথিভুক্ত হয় না। যদি হত তা হলে সামগ্রিক পরিসংখ্যানটা ভয়াবহ আকার নিত।

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কেন সরকারের কাছে মেয়েদের স্বাস্থ্যের এই অত্যন্ত জরুরি দিকটি অগ্রাধিকার পাবে না? কেন গর্ভপাতের ঝুঁকির দিকগুলি একটি পরিবারের কাছে তো বটেই, একটি কিশোরী মেয়ের কাছেও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে না?

শুধু কি ক্লিনিক, ইদানিং 'গর্ভপাতের সহজ উপায়' টিভি এবং খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের দৌলতে কারোর অজানা নয়। দোকান থেকে ওষুধ কেনো, খাও আর ব্যস হয়ে গেল। সত্যিই কি এতটাই সহজ সব? এতটাই? শুনতে পাই, দুর্গাপুজো, ডান্ডিয়া, দিওয়ালির দিন কয়েক পর নাকি প্রতি বছরই এই সব ওষুধের বিক্রি এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায় বিভিন্ন ওষুধের দোকানে। নিয়ম অনুযায়ী, এই সব ওষুধের কোনোটাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়। অথচ দোকানে গেলে দিব্যি 'ওভার দ্য কাউন্টার' মিলছে এই সব ওষুধ। বহু ক্ষেত্রে ওষুধে কাজ হচ্ছে, আবার বহু ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়ে মেয়েটির জীবনসংশয় হচ্ছে। কিংবা এমন সব শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে যার জের মেয়েটিকে বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন।

স্কুলের যৌনশিক্ষায় অদ্ভুত ছবি এবং ততোধিক অদ্ভুত ভাষায় যা শেখানোর চেষ্টা চলে, তার বাইরে সমস্যার গভীরে ঢুকে কেন কিছু ভাবতে পারেন না আমাদের নীতি নির্ধারকরা? যেখানে অসুরক্ষিত গর্ভপাত প্রতি বছর এত জীবন কেড়ে নিচ্ছে, সেখানে এ নিয়ে কেন সরকারি তরফে প্রচার

শুধু কি ক্লিনিক, ইদানিং 'গর্ভপাতের সহজ উপায়' টিভি এবং খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের দৌলতে কারোর অজানা নয়। দোকান থেকে ওষুধ কেনো, খাও আর ব্যস হয়ে গেল। সত্যিই কি এতটাই সহজ সব?

হবে না? কেন বাবা-মায়েদেরও সচেতন করার চেষ্টা চলবে না? হাতুড়ে ডাক্তার বা লাইসেন্সহীন ক্লিনিকে যাওয়ার ফল কত ক্ষতিকর হতে পারে, সে নিয়ে কেন লাগাতার প্রচার চলবে না? কেন লোকের কাছে শুনে স্রেফ আন্দাজে ওষুধ খাওয়ার খেসারত নিয়ে সচেতন করা হবে না?

যৌনতা নিয়ে ঢাকাঢাক গুড়গুড় করার অনেক খেসারত মেয়েদের দিতে হয়েছে। এ বার না হয় একটু ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা হোক। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখিকা একজন প্রাবন্ধিক।

শব্দ-ছক

সমাধান

১ হি				২ আ	ল	৩ ট্রা	সো	নো	গ্রা	৪ ফি	
মো			৫ বা	য়ো		ই				৬ ট	ফি
৭ গ্লো	৮ কো	৯ মা		ডি		১০ ক্লি	সা	রি	ন		
১১ বি	লি	রু	বি	ন		সা					
ন		ন				রা			১২ শ্বা		১৩ এ
			১৪ পা			১৫ ই	ডি	১৬ পা	স		ন
		১৭ প্যা	রা	ন	য়ে	ড		ল			কে
১৮ চি		রা						স			ফে
১৯ রু	বে	লা					২০ কো			২১ লা	লা
নি		২২ ই	ন	স	ম	নি	য়া				ই
		জ					ক		২৩ হা		টি
২৪ সা	ই	ড	এ	ফে	ক্ট			২৫ টা	ই	ফা	স

এনজিও-দের সঙ্গে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

বোধহয় ডেভিড ওয়ার্নারের *Helping Health-works Learn*-এ পড়েছিলাম: 'outside funding means outside control'। শহীদ হাসপাতাল বা মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল কোনো ফান্ডিং এজেন্সির অনুদান ছাড়াই। তা বলে কখনো কোনো ফান্ডেড এনজিও-র সঙ্গে কাজ করিনি এমনটা নয়।

কানোরিয়া সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে সর্বক্ষণের ডাক্তার হিসেবে যোগ দিলাম ১৯৯৫-এ। কানোরিয়া আন্দোলনের অন্যান্য সর্বক্ষণের কর্মীদের সঙ্গে আমার ফারাক ছিল—অন্যদের হোলটাইমার অ্যালাউন্স জোগাত রাজনৈতিক সংগঠন, আমাকে শ্রমিক ইউনিয়ন শ্রমিকদের কাছ থেকে এ বাবদ চাঁদা তুলে। কারখানা যখন বন্ধ তখন আমার ভাতাও বন্ধ, এমনটা চলেছিল প্রায় তিন বছর, ১৯৯৮ অবধি।

আমার স্ত্রী স্কুলশিক্ষিকা, ভাতা বন্ধের সময় তাঁর আয়ে কাজ চলত। কোনো এক অর্থনৈতিক সংকটের সময় প্রথম এক ফান্ডেড এনজিও-এ কাজ করা মাস তিনেক। এনজিও-র প্রধান মেডিক্যাল কলেজে আমার দশ বছরের সিনিয়ার। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই কানোরিয়া আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসের কারণে বহু বছরের যোগাযোগ তাঁদের সঙ্গে। তাঁদের সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে হিরোইন নেশাগ্রস্তদের নির্বিষকরণের জন্য এক কর্মসূচি চালায় হাওড়ার কোনো এক ছোটো শহরে। তাঁদের কর্মসূচিতে একজন পার্ট-টাইম মেডিক্যাল অফিসারের দরকার—

প্রশ্ন উঠেছিল—টাটার অর্থে সমাজসেবার কাজ করা কতটা যুক্তিযুক্ত। প্রসঙ্গত বলে রাখি মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেলের অনেক সদস্যই টাটার এক বা একাধিক ট্রাস্টের অর্থানুকূল্যে জনস্বাস্থ্যের কাজ করেন।

সোম থেকে শুক্রবার বিকেলে ২ ঘণ্টা করে ডিউটি, ভাতা মাসে তিন হাজার টাকা। কাজের সময় আমার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজের সময়ের সঙ্গে ম্যাচ করে গেল, আর আমার যা প্রয়োজন তা এই ভাতায় মিটল।

সংস্থার প্রধান আমাকে বিশ্বাস করতেন—আমাকে সংস্থার প্রশাসনে ঢুকিয়ে নিলেন যাতে আমি তাঁর কাজের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারি। আর সেই সুযোগে আমি প্রথম চাক্ষুষ করলাম ফান্ডেড এনজিও কীভাবে চলে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পেতে গেলে মাসে অন্তত ৩০ জন হিরোইন নেশাগ্রস্তের চিকিৎসা করতে হয়। রোগী হত মেরেকেটে মাসে ৫-৬ জন। বাকি ২৪-২৫ কাল্পনিক নামে বেড-হেড টিকিট তৈরি হত। সরকারি দল পরিদর্শনে আসার আগে পাড়ার ছেলেদের টাকা-পয়সা দিয়ে রোগী সাজিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখা হত। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক মাসে ছেচল্লিশ হাজারের একটু বেশি টাকা দিত কর্মসূচি চালাতে—পূর্ণ সময়ের মেডিক্যাল ডিরেক্টরের ভাতা মাসে ৪,৫০০ টাকা, পার্ট-টাইম মেডিক্যাল অফিসারের ৩,০০০ টাকা, সাইকিয়াট্রিস্টের মাসে ৩,০০০ হাজার টাকা, নার্সিং কর্মীর ১,৮০০ টাকা, ওয়ার্ডবয়ের ১,২০০ টাকা। মেডিক্যাল ডিরেক্টরকে বলা হল সকালে চেম্বারে যাওয়ার পথে একবার নেশামুক্তি কেন্দ্র হয়ে যেতে, আর অন কল থাকতে—৪,৫০০ টাকার বদলে দেওয়া হত ৩,৫০০ টাকা। সাইকিয়াট্রিস্টের ৫ দিন আসার কথা, বলা হল একদিন আসুন, দেওয়া হত ১,৫০০ টাকা। ডাক্তাররা না হয় কম সময় কাজ করে কম টাকা পেলেন। কিন্তু নার্সিং কর্মী বা ওয়ার্ডবয় তো কাজ করেন সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা। ওয়ার্ডবয়কে ১২০০ টাকার ভাউচারে সই করিয়ে হাতে দেওয়া হত ৮০০ আর সংস্থায় তিনি ৪০০ টাকা দান করেছেন এই মর্মে একটা রসিদ।

কথা বলে সংস্থার চালচলন পালটানোর চেষ্টা করি। অসফল হয়ে ছেড়ে আসি একমাসের নোটিশ দিয়ে।

এরপর যে এনজিও-র সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তা হল সিডিএমইউ-Community Development Medical Unit। ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের পক্ষে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল '৮০-র দশকের আরম্ভে, তার সূত্রে West Bengal Voluntary Health Association-এর অঙ্গ হিসেবে তার যাত্রা শুরু হয়, পরে অবশ্য স্বশাসিত এক সংস্থা। ১৯৯৫-৯৬ থেকেই মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওষুধের জোগানের বেশির ভাগটা আসে সিডিএমইউ থেকে। ওষুধ-কোম্পানি বা সরবরাহকদের সঙ্গে দাম নিয়ে দরাদরি করে কম দামে কিনে অল্প কিছু লাভ রেখে অন্যান্য এনজিও-কে দেয় এরা। কখনো-সখনো সিডিএমইউ-র সদস্য সংগঠনের কর্মীদের ক্লাস নেওয়া ছাড়া বড়ো দু-টো কাজ করেছি এদের সঙ্গে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। প্রথমটা ভারতের বাজারে অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ ওষুধের availability নিয়ে। এটা জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় একটা কাজও। দ্বিতীয়টা ঝাড়খণ্ডের চার্চ-পরিচালিত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর জন্য প্রামাণ্য চিকিৎসাবিধি (Standard Treatment Guidelines) প্রস্তুতি। পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলোতেও ব্যবহৃত হচ্ছে এই প্রামাণ্য চিকিৎসাবিধি, ব্যবহার করছেন গ্রামীণ চিকিৎসকরাও। সিডিএমইউ-র সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয়নি এখনও।

২০০৭-এর ডিসেম্বরে আমার পুরোনো কাজের জায়গা ছত্তিশগড়ে গেছিলাম—একটা মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতে। একটা নয় আসলে তিনটে মিটিং একই সঙ্গে—শহীদ হাসপাতালের ২৫ বছরপূর্তি, ডা. বিনায়ক সেনের গ্রেপ্তারির পরিপ্রেক্ষিতে মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেল-এর অর্ধবার্ষিক মিটিং আর অল ইন্ডিয়া ড্রাগ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক-এর মিটিং। মিটিং-এ আলোচ্য বিষয় ছিল—'সংঘাতের সময় ডাক্তারদের ভূমিকা'। আমাকে বলতে বলা হয়েছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীর ভূমিকা নিয়ে। সেই আলোচনার সূত্র ধরে প্রশ্ন উঠেছিল—টাটার অর্থে সমাজসেবার কাজ করা কতটা যুক্তিযুক্ত। প্রসঙ্গত বলে রাখি মেডিকো ফ্রেন্ড

সার্কেলের অনেক সদস্যই টাটার এক বা একাধিক ট্রাস্টের অর্থানুকূল্যে জনস্বাস্থ্যের কাজ করেন।

১৯৮৫-তে ভোপালের গ্যাসপীড়িতদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়ার ডাক্তার আমরা কাজ করেছিলাম ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের ব্যানারে। স্থানীয় গণসংগঠন ছিল—জাহরিলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা ও নাগরিক রাহত আউর পুনরবাস কমিটি। এখন স্থানীয় উল্লেখযোগ্য সংগঠন সম্ভাবনা ট্রাস্ট। সম্ভাবনা ট্রাস্টকে ঠিক ফান্ডেড এনজিও বলা যাবে না, কেননা সে ফান্ডিং এজেন্সির পয়সা নেয় না। কিন্তু সে স্বাবলম্বীও নয়, বিদেশি শুভানুধ্যায়ীদের বদান্যতায় কাজ চলে তার। একসময় সম্ভাবনা ট্রাস্টের প্রধান সংগঠক ছিলেন যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার পক্ষে, এখন সম্ভাবনা ট্রাস্ট আধুনিক চিকিৎসা, আয়ুর্বেদ ও যোগের জগাখিচুড়ি দিয়ে গ্যাসপীড়িতদের কষ্ট লাঘব করে। আসলে আয়ুর্বেদে বহু শতাব্দী ধরে কোনো গবেষণা বা উন্নয়ন নেই, কিন্তু আয়ুর্বেদ নাকি জড়িয়ে আছে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাই আয়ুর্বেদ নিয়ে কিছু কাজ হলে বোধহয় বিদেশি অনুদান পাওয়ার সুবিধা।

গত ডিসেম্বরে গ্যাসকাণ্ডের তিরিশ বছর হল, তার আগের দু-বছর গ্যাসপীড়িতদের পরবর্তী প্রজন্মে জন্মগত বিকৃতি নিয়ে সমীক্ষা চলেছিল। সমীক্ষার পয়সা জোগাড় করেছিলেন কানাডাপ্রবাসী এক ভারতীয় চিকিৎসক। ১৯৮৫-তে আমরা ভোপাল যেতাম বম্বে মেলের আনরিজার্ভড কম্পার্টমেন্টে, এবার যাতায়াতের প্লেনের টিকিট আগে থেকে পাঠিয়ে দেওয়া ছিল। ৩-৪ দিন করে ঘুরে এলেন এক একটা সমীক্ষক দল। সমীক্ষক দলে গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের বদলে যুক্ত করা হল বড়ো বড়ো ডিগ্রিধারী ডাক্তারদের। তাঁদের দিয়ে যে কাজ করানো হল তা কিন্তু যেকোনো জেনারেল ফিজিশিয়ানও করতে পারতেন, যেসব বিষয়ে তাঁরা বিশেষজ্ঞ সেগুলোর সঙ্গে জন্মগত বিকৃতি চেনার কোনো সম্পর্কই নেই। সমীক্ষকদের রাখা হল আরামদায়ক গেস্টহাউসে। ৩-৪ দিনের জন্য তাঁরা সমাজসেবা করে এলেন।

২০১৫-এর ফেব্রুয়ারিতে দু-টো অভিজ্ঞতা হল। পিপলস এডুকেশন কাউন্সিল-এর উদ্যোগে ম্যাঙ্গালোরে প্রথম সর্বভারতীয় মেডিক্যাল ও হেলথ সায়েন্স এডুকেশন কনফারেন্স ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। আর তৃতীয় সপ্তাহে নয়া দিল্লিতে চিকিৎসার পণ্যায়নের বিরুদ্ধে চিকিৎসকদের কণ্ঠস্বর। পিপলস এডুকেশন কাউন্সিল-এর ঘোষিত লক্ষ্য—গণতান্ত্রিক ভারতের জন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এখনও অবধি তিনটে পিপলস এডুকেশন কংগ্রেস হয়েছে, প্রতিটাতে মেডিক্যাল ও হেলথ সায়েন্স শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আরও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করার জন্য আলাদা করে কনফারেন্স।

কনফারেন্স হোস্ট করল ম্যাঙ্গালোরের নিটে (Nitte) বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশাল তাদের শিক্ষাব্যাবসা। মোট ১৮টা কলেজের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, স্কুল অফ নার্সিং, ফিজিওথেরাপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফার্মেসি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—এই ৫টার সম্পর্ক রয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে। প্লেনে ম্যাঙ্গালোর যাওয়ার খরচ জোগাল নিটে বিশ্ববিদ্যালয়, মালিকেরই হোটেল ব্যাবসা—স্টার হোটেলে থাকা-খাওয়া। বাইরে থেকে আসা জনা-কুড়ি ডেলিগেটের মধ্যে জনা-দশেক চিকিৎসক, তাঁদের অর্ধেক আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের। বাকিরা অপ্রমাণিত নানান ভেষজ নিয়ে চিকিৎসার কথা বললেন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের নিয়মকানুন লঘু করার দাবি তুললেন। গণতান্ত্রিক মেডিক্যাল শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হল কমই। যুক্তি আর কু-যুক্তির লড়াইয়ে কেটে গেল অনেকটা সময়। শিক্ষাব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে গণতান্ত্রিক মেডিক্যাল শিক্ষার কাজ কতটা এগোল বোঝা গেল না।

চিকিৎসাব্যবস্থার পণ্যায়ন নিয়ে রোগীরা বারবার বলেন, কিন্তু ডাক্তারদের সংঘবদ্ধভাবে বলতে শোনা যায় না সাধারণত। গত বছর উদ্যোগ নিয়েছিল পুনের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদের একজন চিকিৎসক কর্মী ভারতের বিভিন্ন মহানগর-শহর-মফস্বল ঘুরে ঘুরে ৭৮ জন ডাক্তারের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন, যাঁরা চিকিৎসাব্যবস্থার পণ্যায়নের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চান। এই সাক্ষাৎকারগুলো প্রথমে সংকলিত হয় *কৈফিয়ৎ* নামে এক মারাঠি বইয়ে। সম্প্রতি ইংরেজি সংস্করণ বেরোল *ভয়েসেস অফ দ্য কনসেন্স ফ্রম দ্য মেডিক্যাল প্রফেশন* নামে। ইংরেজি বইটার ঈষৎ পরিবর্ধিত রূপ পেঙ্গুইন-এর র‍্যানডম হাউস প্রকাশন থেকে বেরোনোর কথা।

যে ৭৮ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাঁদের 'র‍্যাশানাল' বা যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসক বলা যায়। এঁদের মধ্যে ৬৬ জন প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার, মেডিক্যাল কলেজ বা সরকারি হাসপাতালে যুক্ত ৭জন, বাকি ৫ জন অলাভজনক

১৯৮৫-তে আমরা ভোপাল যেতাম বম্বে মেলের আনরিজার্ভড কম্পার্টমেন্টে, এবার যাতায়াতের প্লেনের টিকিট আগে থেকে পাঠিয়ে দেওয়া ছিল।

চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এঁদের মধ্যে ৩৭ জন নিজের নামেই বইটাতে আছেন, বাকি ৪১ জন নানান চাপের কারণে নিজের নামে সাক্ষাৎকার দিতে পারেননি। তাঁরা কে কী বলেছেন তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

ইংরেজি বইটার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল নয়া দিল্লির এইমস-এ ২০১৫-র ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে। কলকাতা থেকে ৭জন সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৩জন নিমন্ত্রিত ছিলেন বইপ্রকাশের অনুষ্ঠানে। কেবল নিমন্ত্রিত বললে ভুল হবে, তাঁদের যাতায়াতের প্লেন-টিকিট কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, থাকার ব্যবস্থা ছিল এক 'স্টার' হোটেলে। বিকেলে বিশাল বাতানুকূল প্রেক্ষাগৃহে বই প্রকাশের আগে দুপুরে কম্যুনিটি মেডিসিন বিভাগে গোল টেবিল বৈঠক—দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৭৮ জনের মধ্যে জনা-কুড়ি, উদ্দেশ্য পণ্যায়ন-বিরোধী ডাক্তারদের এক সর্বভারতীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

চিকিৎসা-সংক্রান্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে, বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কড়া ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্টের পক্ষে অনেক আলোচনা হল। এসবের সমাধান যে একমাত্র Universal Health Care-এ অর্থাৎ সরকার নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেবে এমন এক ব্যবস্থায় সে কথাও বললেন অনেকে। কিন্তু সংগঠকরা নেটওয়ার্কের নাম 'Doctors for Universal Health Care' দিতে দিলেন না। তাঁরা বললেন ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার মানে সরকারি নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসাব্যবস্থা, এমন নাম দিলে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারদের নাকি সঙ্গে পাওয়া যাবে না। আমার মনে হল

সংগঠকরা বোধহয় বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের বড়োসড়ো আঘাত দিতে চান না।

জানেন এই সমস্ত কর্মসূচির খরচ জুগিয়েছে কে? Oxfam-বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এক ফান্ডিং এজেন্সি। ভারতের ডাক্তাররা কোন কোন জায়গায় চিকিৎসার পণ্যায়নের বিরোধিতা করছেন তা জানায় আগ্রহ কীসের Oxfam-এর?

পুনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রধান দুই সংগঠক আমার পুরোনো পরিচিত। বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, তাঁর সঙ্গে ১৯৮৫-তে কাজ করেছি ভোপালের

শিক্ষাব্যবসায়ীর অর্থানুকুল্যে গণতান্ত্রিক মেডিক্যাল শিক্ষার কাজ কতটা এগোল বোঝা গেল না।

গ্যাসপীড়িতদের স্বাস্থ্য আন্দোলনে। তখন তিনি মহারাষ্ট্রের এক গণবিজ্ঞান সংগঠনের হোল-টাইমার, মাসিক ২৫০ টাকা ভাতায় আদিবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যচেতনা-বিস্তারের কাজ করেন। দ্বিতীয়জন আমার সমবয়সি, দেশের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্যুনিটি মেডিসিনে স্নাতকোত্তর। ছাত্রজীবনে সমাজ পরিবর্তনকামী রাজনীতির সংগঠক ছিলেন। অনেক বছর হল তাঁরা ফান্ডেড এনজিও চালান—প্লেনে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ, ঠাণ্ডা ঘরে গোলটেবিল বৈঠক—আর কি তাঁরা খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে কাজ করতে পারবেন!

আমার অভিজ্ঞতার বিবরণ কেবল এই প্রবন্ধে। তাত্ত্বিক আলোচনা করছি না। কিন্তু মনে হয় অধিকাংশ ফান্ডেড এনজিও শেষ বিচারে দেশি-বিদেশি নানা শক্তির ক্রীড়নকেই পরিণত হন। যেসব সংগঠনগুলো টাকা দেয় তারা খুব ভালো করেই জানে কোন কাজে তাদের লাভ। তারা যতটা সংগঠিত, লাভক্ষতি নিয়ে তাদের যতটা স্বচ্ছ ধারণা, অনেক সময় এনজিও-র শুভবুদ্ধি-চালিত পরিচালকদের ততটা সংগঠন বা ধারণার স্বচ্ছতা থাকে না। ফলে এরকমটা ঘটে, আর একবার অনেক কষ্ট করে একটা সংগঠন গড়ে তোলার পর পরিচালকদের শুভবুদ্ধির চাইতে 'বাস্তববোধ' নামক ব্যাপারটাই হয়তো বা প্রধান হয়ে যায়, যে বাস্তববোধ থেকে তাঁদের মনে হয়, এত কষ্ট করে 'ছোটো ছোটো কাজ' করার চাইতে কম খাটনিতে 'বড়ো কাজ' করার সুযোগ ছাড়াটা বোকামি।' স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ এমবিবিএস-জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী, চেঙ্গাইল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক এবং *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদক।

Advt.

With Best Compliment from

A. N. Pharmaceutical Laboratory

টিকা কীভাবে কাজ করে?

ডা. স্বপন বিশ্বাস

আজব কারখানা

মানব শরীর এক আজব কারখানা। বিশ্বব্রহ্মান্ডের রহস্যের মতো এর কোনো তল খুঁজে পাওয়া শক্ত। একটি মাত্র ২কোষ থেকে যে লক্ষ কোটি কোষের উৎপত্তি হয়, সে যেমন রহস্য, তেমনি রহস্য শরীরের বিভিন্ন কোষের কাজকর্ম নিয়ে। প্রতিটি কোষই জীবন্ত। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ আছে। দিন রাত তারা তাদের সেই কাজ করে চলেছে। কোনো কোষ পাকস্থলী থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করছে, কেউ হজমি রস তৈরি করছে, আবার হার্টের কোষ নির্দিষ্ট সময় পরপর সংকুচিত প্রসারিত হয়ে চলেছে—তার জন্য হচ্ছে রক্ত চলাচল। আবার মাথার বহু কোষের জটিল সমাহার অনবরত চিন্তা করে চলেছে—তাও আবার বিভিন্ন রকমের—গ্যালিলিওর কোষ-সমাহার বেশি চিন্তা করেছে আকাশ নিয়ে, আইনস্টাইনের কোষ-সমাহার বিজ্ঞান নিয়ে, আবার রবীন্দ্রনাথের মাথার কোষ-সমাহার ভেবেছে কবিতা নিয়ে! কী করে যে এসব হয়? শুধু চিন্তাই নয়, কোষ-সমাহার এই চিন্তা-উত্তেজনা ছড়িয়ে দিচ্ছে অসংখ্য ইলেকট্রিক সার্কিটের নার্ভ কোষের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, তাদের নির্দেশ দিচ্ছে সেই অনুযায়ী কাজ করার। শুধু শরীরই বা বলি কেন, কোষগুলি তাদের প্রভাব শরীরের বাইরেও বিস্তারলাভ করাচ্ছে, অপরকে প্রভাবিত করছে।

এ কথা বলা শুধু এটুকু বোঝাবার জন্যে যে শরীরের অসংখ্য কোষের বিভিন্ন কাজ আছে। একই ধরনের অনেক কোষ থাকে। তাদের কাজও একই। যেমন লোহিত রক্তকণিকার মূল কাজ হল বাতাসের অক্সিজেন নিয়ে শরীরের অন্য কোষে পৌঁছে দেওয়া। তেমনি আমাদের শরীরে একদল কোষ আছে যারা আমাদের শরীরকে রক্ষা করে চলেছে। এদের নিয়ে আমাদের এবারের আলোচনা। এদের মাধ্যমেই টিকাকরণের ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

বিজ্ঞান এখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে। প্রতিদিনই প্রায় শরীরের মধ্যে থাকা নিত্য নতুন রহস্যের সমাধান হচ্ছে, নতুন কিছু জানা যাচ্ছে। তেমনি টিকাকরণের ব্যাপারটা বুঝতে গেলে খুব সহজভাবে 'ইমিউনিটি'র বিষয়ে বোঝা দরকার। ইমিউনিটির সাধু বাংলা অনাক্রম্যতা। অর্থাৎ আক্রমণ প্রতিরোধ করা। অনাক্রম্যতা না বলে বরং প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধ বললে কথাটা সহজভাবে বোঝা যায়।

আমাদের আগের আলোচনায় বলেছি—মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয় এক শত্রু পরিবেষ্টিত পৃথিবীতে। তাকে আক্রমণ করার জন্যে থাকে ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক নামের বিভিন্ন শ্রেণির জীবাণু। এমনকী জীবাণু ছাড়াও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় ধুলো বালি বা অন্য সব বিষাক্ত জড়পদার্থ থেকে।

আবারও বলছি, মানব শরীর এক আজব কারখানা। শারীরিক দিক থেকে মানুষ বড়ো স্বার্থপর। আপন পর ভেদাভেদটা তার প্রবল। আমার শরীরে যা আছে, তা আমার। অন্য কিছু আমার নয়। তাই আমার শরীরে বা রক্তে অন্য কিছু ঢুকতে দেব না—সে জীবাণু বা বিষাক্ত জড় যাই হোক-না কেন, শরীরে এই ব্যবস্থা থাকে।

শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক এই বাইরের সব পদার্থকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে অ্যান্টিজেন।

অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি নিয়ে দু-চার কথা

অ্যান্টিজেন

সহজভাবে বলতে গেলে আগেই বলেছি যে যেসব বাইরের পদার্থ শরীরের পক্ষে নতুন ও ক্ষতিকারক—সে জড় বা জীবাণু যাই হোক না কেন, তাকেই অ্যান্টিজেন বলে। অর্থাৎ শরীরের, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় শরীরের এই প্রতিরক্ষা বিভাগের কাছে যে সব জিনিস আসে, যা কখনো সে আগে দেখেনি তাই-ই তার কাছে নতুন এবং তাকেই সে ধ্বংস করতে চায়, তাই-ই অ্যান্টিজেন। এমনকী মানুষের নিজের শরীরের কোনো কোষ বা কোষের ভিতরকার কোনো অংশ যা এই বিভাগের কাছে আগে কখনো আসেনি, তাও যদি কোনোক্রমে তাদের কাছে আসে তবে তাকেও সে বাইরের মনে করে ধ্বংস করতে চায়—তাকে বলে অটো অ্যান্টিজেন বা নিজের অ্যান্টিজেন। তখন অবশ্য রোগ-প্রতিরোধ হয় না, উলটে রোগ হয়।

এই অ্যান্টিজেন সবসময় যে সম্পূর্ণ জীবাণু হবে এমন কোনো কথা নেই। কখনো কখনো সেই জীবাণুর অংশও হতে পারে। যেমন ধরা যাক, টাইফয়েডের জীবাণুর শরীরের বিশেষ কোনো অংশ অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করতে পারে। তখন মানবদেহের প্রতিরক্ষা-দপ্তর সেই অংশটাকে ধ্বংস করে দিলেই জীবাণুটি মরে যাবে। এভাবেই জীবাণুর বিভিন্ন অংশ নিয়ে অ্যান্টিজেন তৈরি করে শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সজাগ করা হয় সেটা টিকাকরণের একটা পদ্ধতি।

অ্যান্টিবডি

অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে শরীর যে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করে—তাকেই সহজভাবে অ্যান্টিবডি বলা হয়। এরা ইমিউনোগ্লোবিউলিন নামক এক ধরনের প্রোটিন যৌগ। এরাও আবার বেশ কয়েক রকমের হয়। যেমন—ইমিউনোগ্লোবিউলিন-জি, ইমিউনোগ্লোবিউলিন-এ, ইমিউনোগ্লোবিউলিন -এম, ইমিউনোগ্লোবিউলিন-ডি, ইমিউনোগ্লোবিউলিন-ই। এদের কেউ দু-হাতে মিউকাস মেমব্রেনকে রক্ষা করে (এ) তো কেউ পাঁচ হাতে প্রথমে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েই শত্রুর মোকাবিলা করে (এম)। কারও আয়ু অল্প, আবার কেউ দীর্ঘদিন ধরে শরীরের মধ্যে থেকে শরীরকে রক্ষা করে। আবার কেউ বিশেষভাবে কাজ করে পরজীবী প্রাণীর বিরুদ্ধে। একবার তৈরি হবার পর, এরা যতদিন রক্তে থাকে ততদিনই শরীরকে রক্ষা করে চলে। অর্থাৎ শরীরে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি, যা অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে। এভাবেই টিকাকরণের মাধ্যমে কোনো আধমরা

জীবাণু বা জীবাণুর অংশকে অ্যান্টিজেন হিসাবে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়—শরীর তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে রাখে, পরে যদি সেই জীবাণু আক্রমণ করে তবে আগে তৈরি করা অ্যান্টিবডি অস্ত্র তাকে মেরে ফেলে—ফলে রোগ হয় না।

এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে, কিছু কিছু জীবাণু আছে, যারা তাদের শরীরের এই অ্যান্টিজেন অংশ অনবরত পালটাতে থাকে। যেমন—ম্যালেরিয়ার জীবাণু। শরীর হয়তো ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অ্যান্টিজেন অংশকে ধ্বংস করার জন্যে অ্যান্টিবডি তৈরি করল, কিন্তু জীবাণুটি কিছুদিন পরে তার ওই অংশের বদলে নতুন আরেক প্রকার অংশ তৈরি করে ফেলল, পুরানোটা বাদ চলে গেল। দেখা গেছে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপোরামের ৬ শতাংশ জিন-ই সতত পরিবর্তনশীল। তাই এখনও ম্যালেরিয়ার কোনো টিকা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ঘটনাকে বলে 'অ্যান্টিজেনিক সিফট'।

যখনই শরীরের কোনো অ্যান্টিজেন প্রবেশ করে, তখন শরীরের প্রতিরক্ষা দপ্তর তাকে খতম করার জন্য একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ যেন সেই 'জেড' ক্যাটাগরির ত্রি-স্তর নিরাপত্তা বলয়, যা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা—শরীর যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন কাজ করে চলে।

শরীরের প্রতিরক্ষা দপ্তর

এই প্রতিরক্ষা দপ্তরে আছে নানা ভাগ, নানা শ্রেণি, নানা দপ্তর। প্রতিরক্ষার কাজে যেসব কোষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, তারা রক্তের শ্বেত কণিকার বিভিন্ন সম্প্রদায়। এরা প্রধানত তৈরি হয় অস্থিমজ্জায়। তৈরি হবার পর কিছু লিম্ফোসাইট থাইমাস গ্রন্থিতে গিয়ে টি-লিম্ফোসাইটে পরিণত হয়, আর মানুষের বি-লিম্ফোসাইট পরিণতি লাভ করে অস্থিমজ্জায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এই লিম্ফোসাইটের গুরুত্ব অসীম।

প্রসঙ্গত একটি কথা জানিয়ে দিই, প্রতিটি শিশু প্রতিরোধের কিছু ব্যবস্থা বা সৈন্যসামন্ত নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়, এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা যায় জন্মগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা Innate imunity। তবে বেশিরভাগ ব্যবস্থা সে পরবর্তী সময়ে তৈরি করে নেয়। শত্রুর সংস্পর্শে এসে সে শত্রুর অবস্থা বা ক্ষমতা অনুযায়ী তার মারণ বাণ তৈরি করে—এই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বলে অর্জিত প্রতিরোধ বা Adaptive/Acquired Immmunity। আবার অনেক সময়ে বাইরে থেকেও তাকে মারণ বাণ সরবরাহ করা হয়, তখন তাকে বলে পরোক্ষ প্রতিরোধ বা Passive Immunity।

শরীরের প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাজ বড়ো জটিল। এখানে যেমন সরাসরি খেয়ে ফেলে অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা আছে, তেমনি নানা রাসায়নিক যৌগ দিয়ে তাদের আটকে ফেলে হাত পা বেঁধে ধ্বংস করার ব্যবস্থাও আছে। শত্রু এবং তার আক্রমণ অনুযায়ী যেখানে যখন যে ব্যবস্থা দরকার, শরীর সেটাই কার্যকরী করে।

শুধু তাই নয়, এই দপ্তরের একটা ডাটা ব্যাঙ্ক বা Memory সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থাও আছে। সেখানে প্রশিক্ষিত সৈনিকের মতো কিছু কোষ (Memory B Lymphocyte) থাকে। বিশেষ বিশেষ আক্রমণের জন্যে তারা সবসময় প্রস্তুত। আগে আক্রমণ করেছিল যেসব শত্রু, তাদের মারার কৌশল এবং কী অস্ত্রে এরা মরবে সেই স্মৃতি এরা তাদের মধ্যে রেখে দেয়। ফলে একই শত্রু দ্বারা দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলে এই সব কোষ সহজে এবং তাড়াতাড়ি তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, এমনকী তাদের মারার জন্যে কিছু মারণ বাণ তৈরি করেও রাখে।

টিকাকরণের গুরুত্ব এখানেই। প্রথমে অল্প বা অকেজো শত্রুদের দিয়ে এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তোলা হয়, পরে যদি বেশি সংখ্যায় শত্রু বা শক্তসমর্থ শত্রু শরীরকে আক্রমণ করে, শরীর তার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রু ধ্বংস করে দিতে পারে। সেই রোগ আর হয় না।

ত্রি-স্তর নিরাপত্তা

যদিও ত্রি-স্তর 'জেড' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থার সব ধরনের ব্যবস্থার সঙ্গে টিকাকরণের সম্পর্ক থাকে না, তবুও সংক্ষেপে এদের নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার কুশীলবদের একটু দেখা যাক।

- প্রথমে দুর্গের বাইরে পাঁচিলের মতো করে থাকে চামড়া বা স্কিন।
- তারপরের স্তরে থাকে অনেক রকমের টহলদারি কোষ ও রাসায়নিক।
- সর্বশেষ স্তরে বিশেষভাবে ওই বিশেষ শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র তৈরি করে প্রয়োগ করা—অর্থাৎ অস্ত্রাগার, তাও এক ধরনের কোষের মাধ্যমে হয়—প্লাজমা কোষ।

প্রথম স্তর: চর্ম বর্ম

১. মানুষ নামক এই নিরাপত্তা দুর্গের বাইরের স্তরে আছে দুর্গের পাঁচিলের মতো মানুষের চামড়া। এটি প্রথমস্তর হিসাবে কাজ করে। তবুও পাঁচিল বা দেওয়ালেরও জানালা দরজা রাখতে হয়, তেমনি মানব শরীরও সেই আট কুঠুরি নয় দরজার খেলা। দরজাগুলো, যেমন মুখগহ্বর, পায়ুছিদ্র, কান, চোখ, ইত্যাদিতে মোটা চামড়া না থাকলেও এক ধরনের ঝিল্লি পর্দা দিয়ে তাদের ঢেকে রাখা হয়। একে ডাক্তারি ভাষায় বলে মিউকাস মেমব্রেন (Mucous membrane)। আবার শুধু দেওয়াল নয়, দেওয়াল ও পর্দার উপর ছড়িয়ে দেওয়া থাকে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ, যা জীবাণুদের মেরে ফেলতে সাহায্য করে। যেমন আমাদের চামড়ায় দু-রকমের গ্রন্থি থাকে—এদের থেকে নিঃসারিত হয় ঘাম আর তৈলাক্ত পদার্থ 'সিবাম' এবং এক ধরনের উৎসেচক—লাইসোজাইম। সবাই মিলেমিশে চামড়ার উপরিভাগকে অ্যাসিডের মতো করে রাখে—যার পি.এইচ-৩ থেকে ৫-এর মধ্যে। এই অ্যাসিডের মধ্যে অনেক জীবাণুই বাঁচতে পারে না। আবার লাইসোজাইম সরাসরি ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর ধ্বংস করে জীবাণুকে মেরে ফেলে। মিউকাস মেমব্রেনের মধ্যে এ ছাড়া থাকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন -এ। এর কাজও জীবাণুকে ধ্বংস করা।

দ্বিতীয় স্তর: টহলদারি সৈন্য সামন্ত

যদি কোনো জীবাণু চামড়ার ক্ষত দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে, তার জন্যে আছে অন্য ব্যবস্থা। বিভিন্ন ধরনের একদল সৈনিক কোষ আছে, এবং কিছু রাসায়নিক আছে যাদের কাজ সবসময় টহল দিয়ে অ্যান্টিজেনের খোঁজ করা। যদি কোনো ক্ষতিকারক অ্যান্টিজেন রক্তে প্রবেশ করে তবে এরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাকড়াও করে এবং মারার ব্যবস্থা করে।

- **রাসায়নিক টহলদার**: কয়েক ধরনের রাসায়নিক শরীরের সর্বত্র দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে টহল দেয়। এরা অ্যান্টিজেন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঘিরে ফেলে।

- এদের এক দলের নাম '**কমপ্লিমেন্ট**'। ২০ ধরনের প্রোটিন নিয়ে এই ব্যাটেলিয়ন তৈরি হয়েছে। শরীরের কোথাও অ্যান্টিজেন দেখলে এরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবাণুকে তারের জালি দিয়ে বেঁধে ফেলার মতো ঘিরে নেয়, তারপরে ব্যাকটিরিয়া হলে তার কোষপ্রাচীরে ফুটো করে দিয়ে ধ্বংস করে। তা ছাড়াও এরা অন্য কোষকে সেখানে ডেকে নেয়, যাতে সবাই মিলে আক্রমণকারী জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে।
- আর আছে আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি সদস্য নিয়ে তৈরি '**ইন্টারফেরন**' বাহিনী। বিভিন্ন কোষ এদের তৈরি করে। এদেরও কাজ জীবাণু ধ্বংস করা।
- **টহলদারি সৈন্য কোষ**: যেসব কোষ এই প্রতিরক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করে তারা হল:

  ১. **ফ্যাগোসাইট** বা রাক্ষস কোষ (Phagocyte): এরা সরাসরি অ্যান্টিজেন বা জীবাণু ধরে খেয়ে ফেলে। প্রধানত এরা তিন রকমের হয়।

  - **গ্রানুলোসাইট** বা দানাযুক্ত কোষ: নিউট্রোফিল, ইয়োসিনোফিল ও বেসোফিল এই শ্রেণিভুক্ত। এরা সবসময় রক্তের মধ্যে থেকে টহল দিয়ে বেড়ায়। এদের শরীরের মধ্যে দানাগুলো হল এক প্রকার থলিতে থাকা বিষাক্ত পদার্থ। এরা দলবেঁধে অনেক সংখ্যায় জীবাণুদের আক্রমণ করে সরাসরি খেয়ে ফেলে, নিজেরাও মরে যায়—আত্মঘাতী সৈনিক। মৃত জীবাণু আর এই মৃত কোষ মিলে তৈরি হয় পুঁজ। বড়ো বড়ো কৃমি জাতীয় জীবাণুদের আক্রমণ করে ইয়োসিনোফিল।
  - **ম্যাক্রোফেজ**: এরা দেখতে বড়ো, ধ্বংস করার ক্ষমতাও বেশি। তাই এদের বলে 'বিগ ইটার'। বড়ো রাক্ষস। এরা নিজেরা তো জীবাণু ধ্বংস করেই, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোষদের ডেকে নিয়ে দল ভারী করে। এরা শরীরের বিভিন্ন কলাতে থাকে। রক্তের 'মোনোসাইট' কোষ থেকে এদের উৎপত্তি।
  - **ডেনড্রাইটিক কোষ**: অক্টোপাসের মতো এদের অনেক হাত থাকে তা দিয়ে এরা অ্যান্টিজেনকে আঁকড়ে ধরে খেয়ে ফেলে। তা ছাড়া এদের আর একটা কাজ হল অ্যান্টিজেনকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যের হাতে বা বড়ো সেনাপতির হাতে ছেড়ে দেওয়া, যাতে সেই সেনাপতি অ্যান্টিজেনকে ভালোভাবে মারতে পারে বা মারার কৌশল আবিষ্কার করতে পারে।

অ্যান্টিজেনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করে ম্যাক্রোফেজ এবং ডেনড্রাইটিক কোষ। টিকাকরণে এদের বড়ো ভূমিকা আছে। শত্রুরা প্রথমে এদের হাতে পড়ে। এরা যতটা পারে তাদের ধ্বংস করে, এদের বাকি কাজ সেই শত্রু বা অ্যান্টিজেনকে নিয়ে 'লিম্ফোসাইট' নামক সেনাপতির হাতে তুলে দেওয়া। সে এই শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র তৈরি করে ধ্বংস করে এবং এদের চিনে রাখে। তথ্যভাণ্ডারে ডাটা রেখে দেয়।

যেকোনো টিকার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ রোগের জীবাণু বা জীবাণুর কিছু অংশ, যা অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে, তাকে শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

২. **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte): টিকাকরণের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অসীম। লিম্ফোসাইট রক্তে থাকা এক শ্বেত রক্তকণিকা এদের গঠন, কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—

টি-লিম্ফোসাইট: ম্যাক্রোফেজ বা ডেনড্রাইটিক কোষ অ্যান্টিজেনকে ধরে নিয়ে আসে এদের কাছে। এই কোষের গায়ে বিশেষ বিশেষ অ্যান্টিজেন চিহ্নিত করে তাদের বন্দি করার বিশেষ ফাঁদ বা সেন্সর আছে, যাদের বলা হয় 'রিসেপ্টর'। চার রকমের টি-লিম্ফোসাইট আছে। এই টি-কোষ নিয়ে কিছু বলতেই হবে কেননা এদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টিকাকরণের কার্যকারিতা সম্ভব নয়। শরীরে কোটি কোটি টি-কোষ আছে। প্রত্যেকের গায়েই রিসেপ্টর আছে—যার সাহায্যে তারা শত্রুদের চিহ্নিত করে। এমন কোনো শত্রু নেই যারা এই তল্লাশি এড়িয়ে যেতে পারে। যেকোনো অ্যান্টিজেনই অন্তত বেশ কিছু টি-কোষ দ্বারা চিহ্নিত হবেই। এই চার রকমের টি-কোষ হল—

১. হেল্পার টি কোষ বা সাহায্যকারী টি-কোষ: এরাই 'ইমিউন রেসপন্স' বা প্রতিরক্ষার কমান্ডার। এরা অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত করে সব দপ্তরে অ্যালার্ম বাজিয়ে দেয়। অন্য টি ও বি কোষকে কার্যকরী করে তোলে। এরা অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এসে 'ইন্টারলিউকিন' নামক রাসায়নিক ক্ষরণের মাধ্যমে খুনি (কিলার) কোষদের উত্তেজিত করে, তাদের সংখ্যা বাড়ায়।

২. খুনি বা কিলার টি কোষ: এরা ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া বা শরীরের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্যান্সার কোষকে সরাসরি ধ্বংস করে, গুলি করে মারার মতো।

৩. স্তিমিত করার টি-কোষ (Supressor T cell): যখন কাজ মিটে যায়, তখন এরা সাহায্যকারী কোষের কাজ থামায়। অর্থাৎ বেশি উত্তেজিত কোষের উত্তেজনা থামায়।

৪. ইন্ডিউসার টি-কোষ: এদের কাজ থাইমাস নামক গ্রন্থিতে অন্য টি-কোষকে পরিণত করা।

বি-লিম্ফোসাইট: এরাই টিকাকরণের আসল সেনাপতি। এদের গায়েও অ্যান্টিজেন ধরায় 'রিসেপ্টর' বা ফাঁদ আছে। তবে হেল্পার বি-লিম্ফোসাইটের সহযোগিতা ছাড়া এরা কাজ করতে পারে না। অ্যান্টিজেন ধরার পরে হেল্পার টি-লিম্ফোসাইট ইন্টারলিউকিন-২ ক্ষরণ করে, যার প্রভাবে বি-লিম্ফোসাইটে পরিবর্তন আসে—তারপর তারা দু-রকম নতুন ধরনের কোষে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

- এদের একটা হল প্লাজমা কোষ—যা অ্যান্টিবডি নামক রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে।
- অন্য আরেক ধরনের কোষ তৈরি হয়—যাদের বলে স্মৃতিধর কোষ বা 'মেমারি' কোষ। এরা ওই বিশেষ অ্যান্টিজেনের ধরনধারণ মনে রাখে এবং ওই অ্যান্টিজেন যদি শরীরে আবার প্রবেশ করে তবে খুব তাড়াতাড়ি তারা তাদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিতে পারে। টিকাকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবাণুর বিরুদ্ধে মেমারি কোষ তৈরি করা হয়।

তৃতীয় স্তর: প্রতিরক্ষার অস্ত্রাগার

উপরে আলোচিত টি ও বি লিম্ফোসাইট কোষ এই 'ইমিউন রেসপন্স' বা তৃতীয় স্তরে কাজ করে। যেখানে বি-লিম্ফোসাইটের থেকে তৈরি প্লাজমা কোষ সবসময় অ্যান্টিবডি অস্ত্র প্রস্তুত করার জন্যে তৈরি থাকে।

এই লিম্ফোসাইটরা আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকে। রক্তে তো থাকেই, তা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্যান্টনমেন্টের মতো সেনাশিবির

তৈরি করে একসঙ্গে জড়ো হয়ে থাকে। গুটলি পাকিয়ে, দল বেঁধে। আমাদের ঘাড়ের চারপাশে, বগলে, কুঁচকিতে, কানের পিছনে, শরীরে ভিতরে বিভিন্ন স্থানে স্থানে এরা থাকে—যাদের আমরা গ্ল্যান্ড বলি। জ্বর, সর্দিকাশিতে এরা বড়ো হয়। অর্থাৎ এদের সংখ্যা ও কাজ বাড়ে। এমনকী টনসিলও এরকম একটি বড়ো সৈন্যশিবির। এরা না থাকলে আমরা একদিনও বাঁচতাম কি না সন্দেহ।

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় জানা দরকার

প্লাজমা কোষ যে অ্যান্টিবডি তৈরি করে তার কাজ হল অ্যান্টিজেনকে বিভিন্নভাবে আটকে ফেলা বা ঘিরে ফেলা, যার ফলে রাক্ষস কোষগুলো আরও সহজে অ্যান্টিজেনকে খেয়ে ফেলতে পারে। এর আরও অনেক কাজ আছে, সেই জটিল গোলকধাঁধায় আমরা ঢুকব না। এই প্লাজমা কোষকে অস্ত্রগারের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সে প্রয়োজনমতো রাসায়নিক অস্ত্র সাপ্লাই দেয়। এই যে অ্যান্টিবডি তৈরি করে প্রতিরক্ষা করা—এই ব্যবস্থাকে বলে 'হিউমোরাল ইমিউনিটি' (Humoral immunity)। যেসব জীবাণু শরীরের কোষের মধ্যে না ঢুকে তাকে বাইরে থেকে আক্রমণ করে তার ক্ষেত্রে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করে।

আর এক ধরনের ব্যবস্থায় যখন টি-লিম্ফোসাইট সরাসরি অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে—সে ব্যবস্থাকে বলে 'সেলুলার ইমিউনিটি'। যে ক্ষেত্রে জীবাণু শরীরের কোষের মধ্যে ঢুকে থাকে সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বেশি কার্যকরী। এই দুই প্রকার ব্যবস্থাই টিকাকরণের মাধ্যমে কার্যকরী হয়ে শরীরকে রক্ষা করে।

টিকার অ্যান্টিজেন: আগেই বলা হয়েছে টিকাকরণের মাধ্যমে শরীরে অ্যান্টিজেন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই অ্যান্টিজেন আক্রমণকারী জীবাণু হতে পারে বা তার কোনো অংশ হতে পারে। আমরা সাধারণত যেসব টিকাকরণ করি তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন হল—

- আধমরা জীবাণু: বি.সি.জি. (টিবি বা যক্ষ্মা), পোলিও, হাম, এম.এম.আর. ও চিকেন পক্সের টিকার ক্ষেত্রে।
- মৃত জীবাণু: হুপিং কাশির ক্ষেত্রে।
- জীবাণুর অংশ: হেপাটাইটিস-বি, এ টাইফয়েড, মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা।
- জীবাণু থেকে নিঃসারিত বিষাক্ত পদার্থ: ডিপথিরিয়া, টিটেনাস টক্সয়েড।

সারসংক্ষেপ

- টিকার মাধ্যমে শরীরে বিভিন্ন রোগের মৃত বা রুগ্ন জীবাণু অথবা জীবাণুর অংশবিশেষ শরীরে প্রবেশ করানো হয়, যারা নিজেরা রোগ তৈরি করতে পারে না, কিন্তু শরীরের প্রতিরক্ষা বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলে।
- এই অ্যান্টিজেনকে ধরে নিয়ে যায় ডেনড্রাইটিক কোষ, ম্যাক্রোফেজ, মনোসাইট কোষ। ধরে নিয়ে লিম্ফ গ্রন্থিতে থাকা টি ও বি লিম্ফোসাইটের কাছে দিলে তারা কার্যকরী হয়ে ওঠে।
- মৃত জীবাণু শুধুমাত্র স্থানীয় গ্রন্থি কর্মক্ষম করে, আর জীবিত জীবাণু দীর্ঘস্থায়ীভাবে, শরীরে ছড়িয়ে নানা গ্রন্থিকে কার্যকরী করে তোলে।
- তৈরি হয় ইমিউনোগ্লোবিউলিন যা রক্তে থেকে শরীরকে ওই জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে চলে। প্রাথমিক ইমিউনোগ্লোবিউলিন রক্তে যতদিন থাকে ততদিনই শরীর সেই রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়।
- তৈরি হয় স্মৃতিধর কোষ, যারা আবার ওই জীবাণুর আক্রমণ হলে তাড়াতাড়ি ও সহজে অ্যান্টিবডি তৈরি করে জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। এই স্মৃতিধর কোষ বা মেমারি কোষ তৈরি করাই টিকাকরণের উদ্দেশ্য। যথেষ্ট স্মৃতিধর কোষ তৈরি হতে সময় লাগে, তাই বার বার টিকাকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক ইমিউনোগ্লোবিউলিন তৈরি করিয়ে শরীরকে রক্ষা করা হয়। এই জন্য অনেকবার পোলিও, ডি.পি.টি. ইত্যাদি টিকা দেওয়া হয়।
- বুস্টারের মাধ্যমেও স্মৃতিধর কোষের সংখ্যা ঠিক রাখা হয় বা বাড়ানো হয়।
- যেসব রোগ শুধুমাত্র মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়, তাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো আক্রান্ত মানুষ না থাকে তবে রোগের জীবাণুও থাকবে না। ফলে একদিন পৃথিবী থেকে নির্মূল হবে রোগ। এই জন্য একসঙ্গে একই দিনে সব লোককে টিকাকরণ করলে কারও শরীরে গিয়েই আর রোগের জীবাণু বাসা বাঁধতে পারবে না, এই জন্যে বিভিন্ন দেশে একই দিনে কোনো বিশেষ রোগের জন্যে টিকাকরণ করা হয়, যেমন আমাদের দেশে 'পালস পোলিও' দেওয়া হয়। এতে সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের সকলের জন্যেই প্রতিরক্ষা স্তর বেড়ে যায়— 'হার্ড' ইমিউনিটি বা সকলের ইমিউনিটি বাড়ে।

এতকিছু লেখার উদ্দেশ্য একটাই, যাতে সবাই তার শিশুকে সঠিক সময়ে টিকাকরণ করেন, তার শিশুকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করেন। শুধু তার নিজের শিশুই নয়, 'হার্ড' ইমিউনিটির মাধ্যমে অন্য শিশুও পরোক্ষভাবে রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

এই ইমিউনিটির সম্পূর্ণ বিষয়টা জটিলই শুধু নয়, জটিলতর। তাই কতটা বোঝানো গেল জানি না, সব কিছু ধৈর্য নিয়ে পড়াও কষ্টকর। তবু যারা পড়বেন, তাদের যদি কোনো ধারণা তৈরি হয়, তবেই লেখা সার্থক হবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. স্বপন বিশ্বাস, এমবিবিএস, ডিসি এইচ, এমডি, শিশুরোগ বিশেজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

● বাণিজ্যিক নয়- চিকিৎসা হোক মানবিক

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র
কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন, ২০০২

(দ্বিতীয় অংশ)

২০০২ সালে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (Medical Council of India) ডাক্তারদের অবশ্য পালনীয় একটি 'কোড অফ এথিক্স' তথা 'আচরণবিধির বিধিবদ্ধ আইনসমূহ' জারি করে। তারপর তার কিছু সংশোধন হয়। এখানে আমরা ২০১০ সাল ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত সংশোধন সমেত সেই কোডের অনুবাদের দ্বিতীয় অংশ পেশ করছি। আইনি বিষয় অনুবাদে ভুল-ত্রুটি খুব বড়ো অসুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই পাঠকদের কাছে অগ্রিম অনুরোধ, এই লেখাটিকে জনচেতনা বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বলেই মনে করবেন, এবং আইনি কোনো ব্যবস্থা নেবার আগে ইংরাজিতে লেখা মূল আইনটি দেখে নেবেন। ইন্টারনেটে এই আইনটি ইংরাজিতে পাওয়া যায় মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র ওয়েবসাইটে ; আমরা এটি পেয়েছি http://www.mciindia.org/RulesandRegulations/CodeofMedicalEthicsRegulations2002.aspx থেকে।

'মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' (Medical Council of India) বা সংক্ষেপে এমসিআই হল ভারতে সমস্ত ডাক্তারদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এখানে 'ডাক্তার' বলতে আধুনিক চিকিৎসার ডাক্তারদের (লোকমুখে যা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বলে সমধিক পরিচিত) কথা বুঝতে হবে, অন্যান্য ধারার চিকিৎসক, যথা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র নেই।

ভারতে ডাক্তারি (আধুনিক) শিক্ষাব্যবস্থার মান স্থির করা ও তা বজায় রাখা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র অন্যতম কাজ। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত ডাক্তারি ডিগ্রি-ডিপ্লোমা ভারতে আইনি মান্যতা পাবে কিনা সেটাও এমসিআই ঠিক করে। ডাক্তারি প্র্যাকটিস করার মান নির্ধারণ করে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও এই সংস্থারই।

মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর একটা আইনি ভূমিকা রয়েছে। কোনো ডাক্তার তাঁর কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করছেন কিনা সেটা দেখার প্রাথমিক আইনি দায়িত্ব মেডিক্যাল কাউন্সিল-এরই। ক্রেতা সুরক্ষা আদালত বা সাধারণ আদালতেও মেডিক্যাল কাউন্সিল ডাক্তারির যে মান নির্ধারণ করে দিয়েছে, মোটামুটি সেই মানই বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। তাই মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র 'কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন' ডাক্তার ও রোগী, দু-জনের ক্ষেত্রেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা সেই কোডের অনুবাদ প্রকাশ করছি। এই সংখ্যায় তার দ্বিতীয় অংশ। আইনি বিষয় অনুবাদে সামান্য এদিক-ওদিক খুব বড়ো অসুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই পাঠকদের কাছে অগ্রিম অনুরোধ, এই লেখাটিকে জনচেতনা বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বলেই মনে করবেন, এবং আইনি কোনো ব্যবস্থা নেবার আগে ইংরাজিতে লেখা মূল আইনটি দেখে নেবেন, সেটি ইন্টারনেটে লভ্য।

রোগীদের প্রতি চিকিৎসকের কর্তব্য

২.১ রোগীর প্রতি নৈতিক কর্তব্য

২.১.১ একজন ডাক্তার প্রত্যেক মানুষকেই পরিষেবা দেবেন, তা যেমন হয় না, কিন্তু অসুস্থ ও আহতদের ডাকে সাড়া দিতে সদা প্রস্তুত থাকা উচিত, এবং তাঁর পেশাদারি কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব (যা তিনি পালন করে থাকেন) এর উচ্চমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকবেন। চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর স্বাস্থ্য ও জীবন সম্পর্কে বিস্মৃত হলে চলে না, যা কিনা ডাক্তারের দক্ষতা ও মনোযোগের ওপর নির্ভর করে। চিকিৎসকের সবসময় এই প্রচেষ্টা থাকবে যে, রোগীকে যে সময় আসতে বলা হয়েছে, সেই সময় যাতে সবরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া যায়। একজন রোগীকে ডাক্তার এরকম পরামর্শ দিতেই পারেন যে, সেই রোগী অন্য কোনো চিকিৎসকের পরিষেবা নিন। কিন্তু জরুরি অবস্থায় সেই রোগীর চিকিৎসা, উপস্থিত ডাক্তারকে করতেই হবে। কোনো ডাক্তারই রোগীর জরুরি চিকিৎসা করাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। কিছু যুক্তিযুক্ত কারণে, যেমন কোনো রোগী যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনো যন্ত্রণায় কষ্ট পান যা ওই ডাক্তারের অভিজ্ঞতার বাইরে তবে তিনি ওই রোগীর চিকিৎসা নাও করতে পারেন এবং অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিতে পারেন।

২.১.২ ডাক্তারের কোনো অক্ষমতা যদি প্রকাশ পায় যা রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর ও রোগীর সুস্থ স্বাভাবিক চলনে প্রভাব ফেলতে পারে, তবে সেই ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করতে পারবেন না।

২.২ সহিষ্ণুতা, বিনম্রতা ও গোপনীয়তা

সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতা একজন ডাক্তারের চরিত্র চিত্রণ করে।

রোগী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক যেসব গোপন তথ্য চিকিৎসককে দিয়েছেন

চিকিৎসক সেগুলো গোপন রাখবেন, একমাত্র রাষ্ট্রের আইন যদি সেই তথ্য চায় তবে সেটা জানানো যেতে পারে।

কোনো কোনো সময়, একজন ডাক্তারকে ঠিক করতে হবে তার কাজটা আসলে কী! একজন রোগী যেসব গোপন কথা তাঁকে জানিয়েছে, সেটার সাহায্যে তিনি আর একজন সুস্থ মানুষকে কোনো ছোঁয়াচে রোগ থেকে রক্ষা করবেন কিনা সেটা ডাক্তারকে বিবেচনা করতে হবে। নিজের পরিবারের একজনের ক্ষেত্রে চিকিৎসক যেমন আচরণ করতেন, ঠিক সেভাবেই এক্ষেত্রেও চিকিৎসককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২.৩. আরোগ্যর সম্ভাবনা

ডাক্তার-রোগীর শারীরিক অবস্থা বিষয়ে অতিশয়োক্তি করবেন না আবার গৌণভাবেও দেখাবেন না। রোগীর আত্মীয়পরিজনকে রোগীর শারীরিক অবস্থাটা ঠিক কী তা ডাক্তার এমনভাবে জানাবেন যে রোগী ও তাঁর পরিবারের স্বার্থ সবচেয়ে ভালোভাবে সুরক্ষিত হয়।

২.৪ কোনো রোগী অবহেলিত হবেন না

চিকিৎসক তার ইচ্ছামতো রোগী দেখতেই পারেন, কিন্তু সংকটাবস্থায় তাকে যেকোনো রোগী দেখতেই হবে। কোনো একজন রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব যদি নিয়ে থাকেন তবে তাকে অবহেলা করতে পারবেন না এবং মাঝপথে বিনা নোটিশে চিকিৎসার দায়ভার তিনি ঝেড়ে ফেলতেও পারেন না। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চিকিৎসক এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না যেখানে রোগীকে অবহেলা করা হয় বা রোগী সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন।

২.৫ ধাত্রীবিদ্যায় চিকিৎসক নিয়োগ

যে চিকিৎসক একজন প্রসূতির তত্ত্বাবধানের ভার পেয়েছেন তিনি স্বয়ং না থেকে আর একজন যদি শিশুজন্মের তদারকি করেন, তাহলে দ্বিতীয় চিকিৎসক এ বাবদে পেশাগত ফি পাবেন। কিন্তু প্রথম চিকিৎসক ফিরে এলে দ্বিতীয়জন রোগীকে প্রথম চিকিৎসকের কাছে ফিরিয়ে দেবার অনুমতি চাইবেন।

৩. পরামর্শ নেওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারের কর্তব্য

অপ্রয়োজনীয় পরামর্শ এড়িয়ে চলা

৩.১.১ রোগীর কঠিন রোগ হলে এবং সন্দেহজনক কিছু মনে হলে অথবা কঠিন অবস্থায় চিকিৎসক (অন্য চিকিৎসকের) পরামর্শ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেই পারেন কিন্তু যেকোনো অবস্থাতেই তা অবশ্যই রোগীর স্বার্থের ওপর ভিত্তি করেই বিচার্য হবে, অন্য কোনো অবস্থা বিচার্য হবে না।

৩.১.২ প্যাথোলজিস্টের/রেডিওলজিস্টের পরামর্শ বা কোনো ডায়াগনোস্টিক ল্যাবের পরীক্ষানিরীক্ষা সবই প্রয়োজন পড়লে করা হবে, রুটিন আকারে নয়।

৩.২ রোগীর সুবিধার্থে পরামর্শ

প্রতিটি পরামর্শ থেকে রোগীর কী সুবিধা হচ্ছে সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে ডাক্তার ওই রোগীর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত তাদের রোগীকে ও রোগীর অ্যাটেনড্যান্টদের স্পষ্টভাবে সব বলতে হবে।

৩.৩ সঠিক সময়ে পরামর্শ

ঠিক সময়ে পরামর্শ দেওয়ার দিকে চিকিৎসকের নজর থাকবে।

৩.৪ পরামর্শ নেওয়ার পর রোগীকে তার বিবরণ দেওয়া

৩.৪.১ পরামর্শদানকারী চিকিৎসকের উপস্থিতিতেই রোগী বা তার বাড়ির লোককে স্পষ্টভাবে বিবৃতি দেওয়া হবে (যদি না আগেভাগেই অন্য রকম করা স্থির হয়ে থাকে)। পরামর্শদানকারী চিকিৎসকের চিকিৎসা সম্পর্কিত মতামত রোগীর বা তাঁর আত্মীয় পরিজনের কাছে প্রকাশ করার দায়িত্ব, যে চিকিৎসক দেখভাল করছিলেন তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকবে।

৩.৪.২. মতপার্থক্য অকারণে উন্মোচিত না করে যখন অসমাধেয় মতপার্থক্য তৈরি হবে তখন স্পষ্টভাবে ও নিরপেক্ষভাবে রোগী ও রোগীর বাড়ির লোককে তা জানাতে হবে। এক্ষেত্রে রোগীর কাছে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অন্য পরামর্শ নেওয়ার রাস্তা খোলা থাকবে।

৩.৫ পরামর্শের পর সুচিকিৎসা

পরামর্শদানকারী চিকিৎসক যে সিদ্ধান্তই দিন না কেন, প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক, যদি অপূর্বকল্পিত প্রয়োজন পড়ে তবে পরবর্তী ক্ষেত্রে চিকিৎসার কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন; কিন্তু পরবর্তী পরামর্শ নেওয়ার সময়ে যে যে পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে হবে। প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে সংকটাবস্থায় পরামর্শদানকারী চিকিৎসক একই 'সুবিধা' পাওয়ার অধিকারী। উপস্থিত চিকিৎসক রোগীকে যেকোনো সময়ে ওষুধ লিখে দিতে পারেন, যেখানে পরামর্শদানকারী চিকিৎসক শুধুমাত্র সংকটাবস্থায় ওষুধ দেবেন অথবা বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডাকলে তবে ওষুধ দেবেন।

৩.৬ যখন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হবে

যখন কোনো রোগীকে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হবে তখন রোগীর রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিশেষজ্ঞকে পাঠাতে হবে, বিশেষজ্ঞ তার মতামত লিখিতভাবে প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসককে দেবেন।

৩.৭ পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য খরচ

ডাক্তারকে তাঁর পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ তার চেম্বারে বা হাসপাতালে যেখানে তিনি রোগী দেখেন, বোর্ডে পরিষ্কারভাবে লিখে জানাতে হবে। যদি ডাক্তার কোনো ওষুধ নিজে প্রয়োগ করে থাকেন সেক্ষেত্রে সেটা ব্যবস্থাপত্রে পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে হবে।

৩.৭.২. চিকিৎসককে ব্যবস্থাপত্রের ওপরে তার নাম, পদ ও রেজিস্ট্রি নম্বর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

নোট : সরকারি হাসপাতালে, রোগীর ভিড় বেশি থাকে, তাই ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসকের সইয়ের নীচে চিকিৎসকের নাম থাকতে হবে।

৪. চিকিৎসকের মধ্যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা

৪.১ একজন চিকিৎসক অন্য একজন চিকিৎসক ও তাঁর পরিবারভুক্ত নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসা বিনা পারিশ্রমিকে করবেন, এবং সেটা তাঁর কাছে আনন্দ ও বিশেষ সুযোগ বলে প্রতিভাত হওয়া উচিত।

৪.২ পরামর্শ গ্রহণে আচরণ

পরামর্শ করার সময় কোনোরকম কপটতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। যিনি ওই নির্দিষ্ট কেসটির দায়িত্বে থাকবেন তাঁর কথাই মানা হবে, কোনোরকম মন্তব্য করা বা বিবৃতি দেওয়া হবে না যা তাঁর ওপর ন্যস্ত বিশ্বাসকে আঘাত করে—এই ক্ষেত্রে কোনোরকম আলোচনা রোগী বা রোগীর বাড়ির লোকের সামনে করা হবে না।

৪.৩ পরামর্শদানকারী চিকিৎসক কেসটির দায়িত্ব নেবেন না

যে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হবে তিনি সাধারণত কেসটির দায়িত্ব

নেবেন না, বিশেষ করে রোগী বা তার পরিজনদের অনুরোধ মেনে তো নয়ই। পরামর্শদানকারী চিকিৎসক সুপারিশকারী (প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত) চিকিৎসকের সমালোচনা করতে পারেন না। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্পর্কে সুপারিশকারী ডাক্তারের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন।

৪.৪ বিকল্প নিয়োগ

কোনো চিকিৎসক যদি কিছু সময়ের জন্য চিকিৎসাচর্চা থেকে বিরতি নেন ও তাঁর রোগীর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অন্য কোনো চিকিৎসককে অনুরোধ করেন তাহলে পেশাদারি ভদ্রতা বা শিষ্টাচারের খাতিরে, যদি তিনি সমর্থ হন তবেই সেইসব রোগীর দায়িত্ব নেবেন। এই ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে চিকিৎসক রোগী দেখবেন তিনি পূর্বের চিকিৎসকের স্বার্থ ও সুনামের কথা মাথায় রেখে রোগী দেখবেন এবং যতক্ষণ না আগের চিকিৎসক ফিরে আসছেন ততক্ষণ অবধি এই রোগীদের যত্নসহকারে চিকিৎসা করবেন।

৪.৫ অন্য ডাক্তারের কেস পরিদর্শন

কোনো ডাক্তার যখন প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁকে অসুস্থতা বা আঘাত পরিদর্শন করে রিপোর্ট তৈরি করে পেশ করতে হয়, সেই রিপোর্ট তৈরি করার সময় যে ডাক্তার দায়িত্বে ছিলেন তাকে জানাতে হবে যাতে তিনি চাইলে উপস্থিত থাকতে পারেন। সেই প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত ডাক্তার শুধুমাত্র রিপোর্ট করবেন, রোগনির্ণয় বা অবলম্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করবেন না।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে

- একজন ডাক্তার সব রোগীর দায়িত্বভার নিতে বাধ্য নন বটে, কিন্তু সব জরুরি রোগীর সেবা সাধ্যমতো করা তাঁর কর্তব্য। রোগীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, আর মনোযোগের সঙ্গে চিকিৎসা করা উচিত। একজন ডাক্তার প্রয়োজনে ঠিক সময় অন্য ডাক্তারকে পরামর্শের জন্য ডাকতেই পারেন, কিন্তু পেশাগত সুবিধা বা পেশাগত ঈর্ষা কোনোটাই এই দুই ডাক্তারের সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত নয়। দুই ডাক্তার রোগীর প্রতিনিধিদের নজরের আড়ালে আলোচনা করতে পারেন। যে ডাক্তার দ্বিতীয় ডাক্তারকে ডাকছেন, তিনি দ্বিতীয়জনকে চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব নথি দেখাবেন, ও তাঁর সামনেই দ্বিতীয় ডাক্তার তাঁর মতামত রোগী বা তাঁর দেখভাল-করা মানুষদের জানাবেন, ও প্রথম ডাক্তারই রোগীর দায়িত্বে থাকবেন। তবে যদি দু-জনে কোনো কারণে একেবারেই একমত না হতে পারেন তো তাঁরা সে কথা রোগীপক্ষকে জানাবেন, ও তাঁদের বেছে নেবার অধিকার দেবেন।
- ধাত্রীবিদ্যার ক্ষেত্রে, যে ডাক্তার প্রসূতিকে দেখভাল করেছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য ডাক্তার প্রসূতির সন্তান জন্মের ভার নিতে পারেন। যেকোনো ডাক্তার নিজের অনুপস্থিতির সময় অন্য ডাক্তারকে তাঁর রোগীর ভার দিতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে পেশাগত ঈর্ষা এড়িয়ে চলতে হবে এবং অন্য ডাক্তারের রোগীর যত্ন নিজের রোগীর চাইতে কম নিলে চলবে না।
- ডাক্তারের কাছে রোগী তাঁর গোপন কথা বলেন। রাষ্ট্র যদি আইনি পথে সেই তথ্য চায় তবে ডাক্তার তা দেবেন। নতুবা সেই তথ্য অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। যদি বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন ছোঁয়াচে রোগ ছড়াতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলে) এই তথ্য অন্যকে দিতেই হয় তাহলে ডাক্তার খুব সাবধানে অবস্থার গুরুত্ব বিচার করে তা দিতে পারেন।
- একজন রোগীর দায়িত্ব নিয়ে সেই দায়িত্ব ডাক্তার ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না, যদিও উপযুক্ত কারণে তাঁকে অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠাতে পারেন। সেক্ষেত্রে চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব নথি দ্বিতীয় ডাক্তার যাতে পান সেটা দেখতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা বা অন্য ডাক্তারের (বিশেষজ্ঞ) পরামর্শ নেবার জন্য অপ্রয়োজনে রোগী পাঠানো উচিত নয়।
- রোগী ও রোগীপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ দিতে হবে। ডাক্তারের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বোর্ডে পরিষ্কারভাবে লিখে রাখতে হবে ও কথা বলার সময় স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। যেসব ওষুধ ডাক্তার নিজে প্রয়োগ করলেন, তা ব্যবস্থাপত্রে লিখে রাখতে হবে। ব্যবস্থাপত্রে ডাক্তারের নাম, পদ, ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখতে হবে।
- যদি কোনো ডাক্তার অন্য ডাক্তারের রোগীকে প্রশাসনিক কারণে দেখেন তো তিনি প্রথম ডাক্তারের রোগী দেখার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পরবর্তী সংখ্যায় এই অনুবাদের পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হবে।

অনুবাদ করেছেন দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

● চিকিৎসা পণ্য নয়, মানবিক অধিকার

বয়স্ক ব্যক্তিদের শরীরের ব্যথার সমস্যা— কেন হয় ও কী তার প্রতিকার

ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই

বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরই অস্থি-মজ্জা নরম হতে ও শুকোতে থাকে, পেশি-তন্তু শিথিল হতে থাকে। এটাই চিরন্তন প্রক্রিয়া। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই বৃদ্ধ হতে অতিবৃদ্ধ প্রত্যেকেরই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অল্প হলেও ব্যথার প্রকোপ দেখা যায়। আজ এই ব্যাপারে একটু আলোচনা করব। তবে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে কাঁধ থেকে হাত পর্যন্ত।

বয়স্কদের হাত ও কবজির ব্যথার কারণ বহুবিধ, যথা—হাতের তালু এবং আঙুলের গাঁটেগাঁটে ব্যথা (নোডাল অস্টিওআরথ্রাইটিস), গাউট/ সিউডো গাউট, ট্রিগার ফিঙ্গার, ম্যালেট ফিঙ্গার, ডায়াবেটিক স্টিফ হ্যান্ড, স্কাফয়েড ফ্র্যাকচার, রাইটার্স ক্রাম্প, গ্যাংগলিয়ন ইত্যাদি।

রাইটার্স ক্র্যাম্প: সাধারণত বয়স্ক লোক যারা দীর্ঘদিন লেখালেখি বা সূক্ষ্ম সংগীতযন্ত্র বাজান তাঁদের মধ্যে এর প্রবণতা বেশি হয়। ওই কাজগুলি করার সময় তাঁদের হাতের এবং আঙুলের আড়ষ্টতা ও বেদনাদায়ক জড়তা দেখা যায়। এর ফলে অস্বাভাবিক টেনশন ও হতাশার উৎপত্তি হয়।

কনুইয়ের ব্যথা: এর প্রকোপ খুব বেশি। কনুইয়ের বাইরে পাশের দিকে সব থেকে বেশি ব্যথা দেখা যায়। একে 'টেনিস এলবো' (lateral epicondylitis) বলে। বহুদিন একনাগাড়ে ভারী বস্তু নিয়ে কাজ করলে বা তোলাতুলি করলে কনুইয়ের বাইরের দিকে অবস্থিত মাংসপেশির উপর চাপ পড়ে। ফলে দারুণ যন্ত্রণা এবং আড়ষ্টতা হয়। কনুইয়ের নাড়াচাড়া সীমিত হয়ে যায়। মূল চিকিৎসা এই গ্রন্থির সম্পূর্ণ বিশ্রাম, ভারী বস্তু হাতের দ্বারা ব্যবহার না করা, সঙ্গে কিছু ব্যথার উপশমদায়ক ওষুধপত্র। সাধারণত শতকরা ৮০ জনের এক বছরের মধ্যে নিরাময় হয়।

কনুইয়ের ভিতরের পাশের দিকের ব্যথা: 'গলফারস এলবো (medical epicondylitis), কনুইয়ের সামনের অংশের ব্যথা (Biceps tendinopathy), কনুইয়ের পিছনের অংশের ব্যথা (Triceps tendinopathy)

সবক্ষেত্রেই কারণ এবং উপসর্গ একই। ফিজিওথেরাপি ও বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম প্রধান চিকিৎসা।

ঘাড়ের ব্যথা: কখনো কখনো ভীষণভাবে আক্রান্ত করে। আবার নিজের থেকেই কমে যায়। তবে পুনরায় হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতেও পারে। সাধারণত শোয়া বা বসার সময় ঘাড়ের অবস্থান ঠিক না থাকার জন্য এই ধরনের ব্যথা হয়। ব্যথা উপশমকারী ওষুধ আর ব্যায়ামে নিরাময় হয়। এখানে বলে রাখা ভালো, সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস নিয়ে পরে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

কাঁধের ব্যথা: খুব গুরুত্বপূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে। ফ্রোজেন শোল্ডার (Adhesive capsulitis) বয়স্কদের এমন একটি অসুখ যা রোজকার কর্মজীবন অচল করে দিতে পারে। স্নান করা, পোশাক পরা, গাড়ি চালানো, হাতে ধরে কোনো জিনিস আনা-নেওয়ার মতো কাজগুলো করতে গেলেও কাঁধে যন্ত্রণা বা আড়ষ্টতা অনুভূত হয়। আমাদের কাঁধের গ্রন্থিতে একটি গোল খাপ বা ক্যাপসুল আছে। হাতের লম্বা হাড়ের গোল মাথাটি এই খাপের ভিতর লাগানো থাকে। এই খাপের মধ্যে যেকোনোভাবে প্রদাহ হলে এটি ফুলে ওঠে। ফলে কাঁধের নাড়াচাড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। হাত উপর-নীচ করা যায় না। এইভাবে ফ্রোজেন শোল্ডার হয়। এই রোগের মূল উপসর্গ কাঁধের দীর্ঘদিনের ব্যথা ও আড়ষ্টতা।

প্রদাহের দরুন ক্যাপসুলের মধ্যে অস্থিসন্ধি পিচ্ছিল রাখার জন্য দরকারি তরল লুব্রিক্যান্টের অভাব হয়—যার ফলে গাঁটের সন্ধিস্থলে ঘর্ষণজনিত কারণে ক্ষয় হয় এবং ভিতরে স্কার টিশু তৈরি হয়। এ ছাড়া চোট-আঘাত, ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের সমস্যা, হৃদ্‌রোগ, রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। সাধারণত এক কাঁধে হলেও প্রতি পাঁচজন রোগীর মধ্যে একজনের দু-কাঁধেই হতে পারে। ৪০ থেকে ৭০ বছর বয়সের ভিতর এবং মেনোপজ হয়ে যাওয়া মহিলাদের মধ্যে এই রোগের সম্ভাবনা বেশি। এই রোগে হতাশা ও মানসিক অবসাদ আসতে পারে। এর চিকিৎসা প্রধানত উপসর্গ ও রোগলক্ষণের তীব্রতা অনুযায়ী করা হয়। ফিজিওথেরাপি প্রধান চিকিৎসা। এ ছাড়া হাইড্রোথেরাপি, শর্টওয়েভ ডায়াথারমি, থারমোথেরাপি, লেসার থেরাপি, ব্যথা উপশমকারী মলম, আকুপাংচার ইত্যাদিরও প্রয়োগ আছে।

ক্রনিক আপার লিম্ব পেইন সিন্ড্রোম: শারীরিক লক্ষণ খুবই কম দেখা যায়। কি-বোর্ডের অতিরিক্ত ব্যবহার, অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া বহুদিনের কর্মপদ্ধতির হঠাৎ করে পরিবর্তন, কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকা, উদ্বিগ্নতা

এবং ঘুমের ব্যাঘাত এই জাতীয় পরিস্থিতিগুলো অনেক সময় এইরকম ব্যথার কারণ হতে পারে।

রোগী যাতে নিজের যত্ন নিজে নিতে পারে

- ওষুধ এবং তার ব্যবহার, ওষুধ সেবনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও তার প্রতিকার
- ব্যায়ামের অনুশীলনী
- অস্থিসন্ধিকে রক্ষা করার কৌশল
- যথোপযুক্ত কৃত্রিম আনুষঙ্গিক প্রত্যঙ্গের (ORTHOTICS) ব্যবহার রপ্ত করা
- যন্ত্রণা লাঘব করার কৌশল অর্জন এবং
- যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানো।

ফিজিওথেরাপিস্টের ভূমিকা অনেক বেশি। তাদেরকে রোগীর এবং তার পরিজনদের বায়োমেকানিক্যাল ডিসফাংশন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতে হবে। ব্যায়ামের প্রকারভেদ ও তার যথাযথ প্রয়োগ রোগী ও তার বাড়ির লোকদের ঠিকমতো বুঝিয়ে দিতে হবে। রোগী যাতে ধীরে ধীরে নিজেই ব্যায়াম অনুশীলন করতে পারে, সেই দিকে নজর রাখতে হবে। ম্যানুয়াল থেরাপি/হাইড্রোথেরাপি সম্বন্ধেও অবহিত করা প্রয়োজন।

বৃত্তিমূলক পরিষেবা প্রদানকারীর (Occupational Therapists) ভূমিকা বয়স্কদের ব্যথার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপরিসীম। তাদের প্রথমে রোগীর বাড়ি ভালোভাবে পরিদর্শন করতে হবে। তার বাড়ির ভিতরের পরিবেশ ও পরিস্থিতি দেখে পর্যালোচনা করতে হবে রোগী এবং তার আত্মীয়দের সঙ্গে—কোনটা রোগীর শরীরের পক্ষে ভালো, কোনটা ক্ষতিকর হতে পারে সেই বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। রোগী নিজেই তার দৈনন্দিন কাজকর্ম কতটা করতে পারছে সেটা তাকে নিরূপণ করতে হবে। আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে বাড়ির লোকদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষিত করতে হবে। হাতের সমস্যা পরীক্ষা করে, হাতের মুঠোর জোর কতখানি (Grip strength) তার পরিমাপ করে নির্দিষ্ট ব্যায়াম, বিভিন্ন orthotics যেগুলো অনায়াসে এবং যন্ত্রণাবিহীনভাবে ব্যবহার করা যায় তার নিদান দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশেষ ধরনের প্যাড লাগানো হাতলসহ চামচ বা ছুরিকাঁটার ব্যবহার কিছু কিছু আঙুল বা কবজির আড়ষ্টতা-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য করা হয়। যাতে করে বস্তুটি সহজেই হাতে ধরা যায় ও কাজ করা যায়। রিস্ট স্প্লিন্ট-এর ব্যবহার প্রয়োজনানুযায়ী শেখাতে হতে পারে। কিছু সময় ইনজেকশন প্রয়োজন হয় যেমন, ট্রিগার ফিঙ্গার।

রোগীর মানসিক সুস্থতা ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাদের নিরন্তর পর্যবেক্ষণ এবং কাউন্সেলিং করার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে কাউন্সেলরের ভূমিকা মূল্যবান।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বয়স্ক ব্যক্তিদের কাঁধ থেকে পুরো হাতের ব্যথার চিকিৎসা সামগ্রিকভাবে একটি Multidisciplinary Team-এর কাজ। যে টিমটার সদস্য কেবলমাত্র ডাক্তার, পেশাদার নার্স, বিশেষ প্রশিক্ষিত সেবিকা, ফিজিওথেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ও কাউন্সেলরই নয়, রোগী এবং রোগীর বাড়ির প্রত্যেকটি লোকই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এটাই বর্তমানে বয়স্ক ব্যক্তিদের চিকিৎসার বিশ্বজননীর দিশা। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রশাসক ছিলেন। বর্তমানে জেরিয়াট্রিক মেডিসিন নিয়ে কর্মরত।

Advt.

If undelivered please return to

Safe International

P-95, Kalindi Housing Estate,
Kolkata - 700089, WB, India,
Ph & Fax - (033) 25223051, 9831908000
Email: safeinternational@gmail.com

ইরানের ফাঁসিপ্রাপ্ত তরুণীর দেহদান: একই বিষয়ে এই দেশের জটিলতা

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী

রেহানে জাব্বারি। এই তরুণী পেশায় ইন্টিরিয়র ডিজাইনার। গত অক্টোবরের শেষে তেহরানের জেলে ফাঁসি হয় ছাব্বিশ বছর বয়সি এই তরুণীর। ২০০৭ সালে মোর্তেজা আবদোলালি সরাবান্দি নামে এক ব্যক্তিকে ছুরি মেরে খুন করেছিলেন রেহানে জাব্বারি। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদেই এই ঘটনা ঘটেছিল। নিজের অফিস নতুন করে সাজানোর ভার ইন্টিরিয়র ডিজাইনার জাব্বারির উপর দিয়েছিলেন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী সরাবান্দি। আর সেই অজুহাতেই জাব্বারিকে একটি অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থা করেন তিনি। জাব্বারি যখন আত্মরক্ষা করছিলেন সে সময়েই ছুরির আঘাতে মারা যান সরাবান্দি।

সরাবান্দি নিহত হবার পর জাব্বারি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়। মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার দাবিতে মুখর হয়েছিল সারা বিশ্ব। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার রক্ষা কমিটি অবশ্য তদন্ত চালিয়ে জানায়, আত্মরক্ষার জন্যই সরাবান্দিকে ছুরি মারতে বাধ্য হয়েছিলেন জাব্বারি। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তেও বিস্তর গোলমাল আছে। তাই জাব্বারির মৃত্যুদণ্ড

এবার আমার অন্তিম ইচ্ছেটা বলি শোনো। কেঁদো না মা, এখন শোকের সময় নয়। ওরা আমায় ফাঁসি দেওয়ার পর আমার চোখ, কিডনি, হৃদ্‌যন্ত্র, হাড় আর যা যা কিছু দরকার যেন আর কারও জীবন রক্ষা করতে কাজে লাগানো হয়। তবে যিনিই এসব পাবেন, কখনোই যেন আমার নাম না জানেন।

স্থগিত রাখা হোক। অবশেষে ফাঁসিই হয়েছিল রেহানে জাব্বারির। কিন্তু মারা যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে মা-কে উদ্দেশ্য করে লেখা এই তরুণীর চিঠি দুনিয়ার সামনে ইরানি বিচার ব্যবস্থার মাথা হেঁট করে দিয়েছে।

না, কবরস্থানে মাটির তলায় তাঁর দেহাবশেষ পচে যাক এমনটা চাননি এই তরুণী, মা শোলেহ পাকরাভানকে জানিয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছার কথা। তিনি চাননি তাঁর নামে কেউ প্রার্থনা করুক বা তাঁর স্মৃতিতে কোনো ফুলের তোড়া কিনুক। অনেক অভিমানে তাঁর অভিযোগ ছিল যে, দুনিয়ায় তাঁকে কেউ ভালোবাসেনি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন দান করা হয়। তাঁর দেহাংশ যাঁদের শরীরে বসানো হবে, তাঁরা যেন কেউই জানতে না পারেন রেহানের কথা। মৃত্যু পথযাত্রী তরুণী চাননি তাঁর দেহাংশ যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁদের কেউ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক।

রেহানে জাব্বারির সেই শেষ চিঠিটি তাঁর মাকে লেখা (অনুবাদিত)

‘‘প্রিয় শোলেহ,

আজ জানতে পারলাম এবার আমার কিসাস (ইরানের আইনব্যবস্থায় কর্মফলবিষয়ক বিধি)-এর সম্মুখীন হওয়ার সময় হয়েছে। জীবনের শেষ পাতায় যে পৌঁছে গিয়েছি, তা তুমি নিজের মুখে আমায় জানাওনি ভেবে খারাপ লাগছে। তোমার কি মনে হয়নি যে এটা আগেই জানা উচিত ছিল? তুমি দুঃখে ভেঙে পড়েছ জেনে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি। ফাঁসির আদেশ শোনার পর তোমার আর বাবার হাতে চুমু খেতে দাওনি কেন আমায়?

দুনিয়া আমায় ১৯ বছর বাঁচতে দিয়েছে। সেই অভিশপ্ত রাতে আমারই তো মরে যাওয়া উচিত ছিল, তাই না? আমার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলার কথা ছিল শহরের কোনো অজ্ঞাত কোণে। কয়েকদিন পর মর্গে যা শনাক্ত করার কথা ছিল তোমার। সঙ্গে এটাও জানতে পারতে যে হত্যার অগে আমাকে ধর্ষণও করা হয়েছিল। হত্যাকারীরা অবশ্যই ধরা পড়ত না, কারণ আমাদের না আছে অর্থ, না ক্ষমতা। তারপর বাকি জীবনটা সীমাহীন শোক ও অসহ্য লজ্জায় কাটিয়ে কয়েক বছর পর তোমারও মৃত্যু হত। এটাই যে হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু সে রাতের আকস্মিক আঘাত সব কিছু ওলটপালট করে দিল। শহরের কোনো গলি নয়, আমার শরীরটা প্রথমে ছুঁড়ে ফেলা হল এভিন জেলের নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে, আর সেখান থেকে কবরের মতো এই শহর-এ রায় কারাগারের সেলে। কিন্তু এ নিয়ে অনুযোগ করো না মা, এটাই নিয়তির বিধান। আর তুমি তো জানো যে মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না।

মা, তুমিই তো শিখিয়েছ অভিজ্ঞতা লাভ ও শিক্ষা পাওয়ার জন্যই আমাদের জন্ম। তুমি বলেছিলে, প্রত্যেক জন্মে আমাদের কাঁধে এক বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া থাকে। মাঝে মাঝে লড়াই করতে হয়, সে শিক্ষা তো তোমার থেকেই পেয়েছি। সেই গল্পটা মনে পড়ছে, চাবুকের ঝাপটা সহ্য করতে করতে একবার প্রতিবাদ জানানোর ফলে আরও নির্মমতার শিকার হয়েছিল এক ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রতিবাদ তো সে করেছিল। আমি শিখেছি, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে অধ্যবসায় প্রয়োজন। তার জন্য যদি মৃত্যু আসে, তাকেই মেনে নিতে হয়।

স্কুলে যাওয়ার সময় তুমি শিখিয়েছিলে, নালিশ ও ঝগড়াঝাটির মাঝেও যেন নিজের নারীসত্তাকে বিসর্জন না দিই। তোমার মনে আছে মা, কত যত্ন করেই না মেয়েদের খুঁটিনাটি সহবত শিখিয়েছিলে আমাদের? কিন্তু তুমি ভুল জানতে মা।

এই ঘটনার সময় আমার সেসব তালিম একেবারেই কাজে লাগেনি। আদালতে আমায় এক ঠাণ্ডা মাথার খুনি হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু আমি চোখের জল ফেলিনি। ভিক্ষাও করিনি। আমি কাঁদিনি কারণ আইনের প্রতি আমার অটুট আস্থা ছিল।

কিন্তু বিচারে বলা হল, খুনের অভিযোগের মুখেও নাকি আমি নিরুত্তাপ। আচ্ছা, মা, আমি তো কোনোদিন একটা মশাও মারিনি। আরশোলাদের চটিপেটা না করে শুঁড় ধরে জানলার বাইরে ফেলে দিয়েছি। সেই আমিই নাকি মাথা খাটিয়ে মানুষ খুন করেছি! উলটে ছোটোবেলার এই কথাগুলো শুনে বিচারপতি বললেন, আমি নাকি মনে মনে পুরুষালি। তিনি একবার চেয়েও দেখলেন না, ঘটনার সময় আমার হাতে লম্বা নখের ওপর কী সুন্দর নেলপালিশের জেল্লা ছিল। হাতের তালু কত নরম তুলতুলে ছিল। সেই বিচারকের হাত থেকে সুবিচার পাওয়ার আশা অতি বড়ো আশাবাদীও করতে পারে কি? তাই তো নারীত্বের পুরস্কার হিসেবে মাথা মুড়িয়ে ১১ দিনের নির্জনবাসের হুকুম দেওয়া হল। দেখেছ মা, তোমার ছোট্ট রেহানে এই কয়েক দিনেই কতটা বড়ো হয়ে গিয়েছে?

এবার আমার অন্তিম ইচ্ছেটা বলি শোনো। কেঁদো না মা, এখন শোকের সময় নয়। ওরা আমায় ফাঁসি দেওয়ার পর আমার চোখ, কিডনি, হৃদ্‌যন্ত্র, হাড় আর যা যা কিছু দরকার যেন আর কারও জীবন রক্ষা করতে কাজে লাগানো হয়। তবে যিনিই এসব পাবেন, কখনোই যেন আমার নাম না জানেন। আমি চাই না এর জন্য আমার সমাধিতে কেউ ফুলের তোড়া রেখে আসুক। এমনকী তুমিও নয়। আমি চাই না আমার কবরের সামনে বসে কালো পোশাক পরে কান্নায় ভেঙে পড়ো তুমি। বরং আমার দুঃখের দিনগুলো সব হাওয়ায় ভাসিয়ে দিও।

এই পৃথিবী আমাদের ভালোবাসেনি, মা। চায়নি আমি সুখী হই। এবার মৃত্যুর আলিঙ্গনে তার পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। তবে সৃষ্টিকর্তার এজলাসে সুবিচার আমি পাবই। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অভিযোগের আঙুল তুলব সেই সমস্ত পুলিশ অফিসারের দিকে, বিচারকদের দিকে, আইনজীবীদের দিকে, আর তাদের দিকে যারা আমার অধিকার বুটের নীচে পিষে দিয়েছে, বিচারের নামে মিথ্যা ও অজ্ঞানতার কুয়াশায় সত্যকে আড়াল করেছে। একবারও বোঝার চেষ্টা করেনি, চোখের সামনে যা দেখা যায় সেটাই সর্বদা সত্যি নয়।

আমার নরম মনের শোলেহ, মনে রেখো সেই দুনিয়ায় তুমি আর আমি থাকব অভিযোগকারীর আসনে। আর ওরা দাঁড়াবে আসামির কাঠগড়ায়।

দেখিই না, সৃষ্টিকর্তা কী চান! তবে একটাই আরজি, মৃত্যুর হাত ধরে দীর্ঘ যাত্রা শুরুর প্রাক মুহূর্ত পর্যন্ত তোমায় জড়িয়ে থাকতে চাই, মাগো! তোমায় যে খুব খু-উ-ব ভালোবাসি।"

ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিচারের নামে নৃশংসতা সর্বজনবিদিত। সেইসব দেশে শোনা যায় যে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের ওপরে আধিপত্য বজায় রাখতে ভয়াবহ শাস্তি দিতেও পিছপা হয় না সেই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে ধর্ষককে হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনাকে নিন্দা জানানোর ভাষা নেই।

রেহানে জাব্বরি কিন্তু এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পর তিনি মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন। ইচ্ছানুসারে তাঁর মরণোত্তর দেহ গ্রহণও করা হয়। ইরানে মরণোত্তর প্রত্যঙ্গ দান নতুন নয়। মস্তিষ্ককাণ্ডের মৃত্যুর পরেও প্রত্যঙ্গ দানের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী ইরান। মধ্যপ্রাচ্য বলতে ধর্মান্ধতা কুসংস্কারে দীর্ণ যে সমাজের কথা আমাদের মনে স্থান করে নিয়েছে সেটা সর্বার্থে সত্য নয়। ইসলামি শাসনে বদ্ধ এই সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয়, প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যঙ্গ প্রদানের পক্ষেই প্রচার করে থাকেন।

একাধারে রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘন অপরদিকে মরণোত্তর দেহদানে উৎসাহ প্রদান এই স্ববিরোধী পথেই চলেছে এইসব দেশ। রেহানে জাব্বারির এই মহান অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে কোনো ধর্মধ্বজীর রক্তচক্ষুর সংবাদ জানা যায় না। তবে মৃত্যুদণ্ডের পর কোনো আইনি জটিলতায় তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়নি।

ভারতবর্ষে এই চিত্রটা ভিন্ন। ইন্দিরা গান্ধী হত্যায় অভিযুক্ত সতবন্ত সিং-এর মৃত্যুদণ্ড হয়। তিনি মরণোত্তর প্রত্যঙ্গ দানের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বহু চর্চিত ধর্ষণে অভিযুক্ত ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুদণ্ড হয়। তাঁর ক্ষেত্রেও মরণোত্তর দেহদানের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো হয়নি। উভয় ক্ষেত্রেই নিয়মের বেড়াজালের অজুহাতে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ।

নিয়মতান্ত্রিক জটিলতার থেকেও বড়ো বাধা মানসিকতার। কারার নাম বদলে হয়েছে সংশোধনাগার। কিন্তু এই দেশে রাষ্ট্রের মানসিকতা বদলায়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সংশোধিত করার পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে? সতবন্ত সিং ও ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ব্যতিক্রমী। যারা মৃত্যুর পর অন্যকে জীবন দিতে দেহ ও প্রত্যঙ্গ দানের কথা ভাবেন, তাঁদের সংশোধিত হওয়ার মতো দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? তাঁদের সংশোধিত হওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ড তো রদ করাই হয়নি, উপরন্তু তাঁদের মহান ইচ্ছাও কার্যকরী করা হয়নি।

এই ঘটনার মধ্য দিয়েই মরণোত্তর দেহ ও প্রত্যঙ্গ দান নিয়ে এই দেশের রাষ্ট্রের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না। যে এই আন্দোলনের মর্যাদা অনুধাবনে অক্ষম। পদে পদে অন্ধ সংস্কার ও গতানুগতিক পথে চলার এই কু-অভ্যাসই সামাজিক প্রগতির অন্তর রায়। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

(তথ্যসূত্র: *কালান্তর* (১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২১) ও *গণদর্পণ* (ডিসেম্বর ২০১৪)

লেখক বিজ্ঞানকর্মী ও প্রাবন্ধিক

জানা ওষুধ অজানা কথা

অ্যাম্লোডিপিন (Amlodipine)

অ্যাম্লোডিপিন ব্যবহার করা হয় উচ্চরক্তচাপ কমাতে। এ ছাড়া হার্টের ব্যথা (অ্যান্‌জাইনা) হওয়া আটকাতেও এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। অ্যাম্লোডিপিন যে শ্রেণির ওষুধ সেগুলোকে বলা হয় ক্যালশিয়াম চ্যানেল ব্লকার। এরা রক্তনালীগুলোকে ঢিলে করে রক্তচাপ কমায় যাতে হার্টকে জোরে পাম্প করতে না হয়। হার্টের রক্তনালীতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে এ ওষুধ হার্টের ব্যথা কমায়। নিয়মিত অ্যাম্লোডিপিন ব্যবহার করলে বুকের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু বুকে ব্যথা আরম্ভ হলে তা কমাতে পারে না, তখন অন্য ওষুধও লাগে।

এ ওষুধ কীভাবে ব্যবহার করা হয়?

মুখে খাবার বড়ি হিসেবে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়, সাধারণত দিনে একবার খেতে হয়। মনে রাখতে যাতে সুবিধা হয় তাই রোজ দিনে একটা নির্দিষ্ট সময়েই খান। ২.৫ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম ও ১০ মিলিগ্রাম বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়। ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ খান, নিজের ইচ্ছামত কম বা বেশি মাত্রায় খাবেন না।

ডাক্তার সাধারণত কম মাত্রায় ওষুধ শুরু করে আস্তে আস্তে মাত্রা বাড়ান।

অ্যাম্লোডিপিন উচ্চরক্তচাপ ও হার্টের ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে কিন্তু রোগটা সারিয়ে দেয় না। শরীর সুস্থ লাগলেও অ্যাম্লোডিপিন খেয়ে যান। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করা বিপজ্জনক।

ওষুধ ব্যবহারের সময় কী কী সাবধানতা নিতে হবে?

- অ্যাম্লোডিপিন বা অন্য কোনো ওষুধে আপনার অ্যালার্জি আছে কিনা ডাক্তারকে বলুন।
- আর কী কী ওষুধ খাচ্ছেন তাও ডাক্তারকে জানান, ওষুধগুলোর মাত্রা বদলাতে হতে পারে।
- আপনার হার্টের বিকলতা বা লিভারের অসুখ আছে কিনা, আগে কখনো হয়েছিল কিনা ডাক্তারকে জানান।
- আপনি গর্ভবতী কিনা, বাচ্চা চাইছেন কিনা বা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন কিনা জানান। ওষুধ চলাকালীন গর্ভবতী হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে জানান।

খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

উচ্চরক্তচাপের জন্য আপনাকে কম নুন খেতে হবে।

ওষুধের একটা মাত্রা খেতে ভুলে গেলে কী করবেন?

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাটা খেয়ে নিন। যদি পরের মাত্রার সময় প্রায় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ভুলে যাওয়া মাত্রা খাওয়ার দরকার নেই। দ্বিগুণ মাত্রায় ওষুধ খাবেন না।

এ ওষুধে কী কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে?

- হাত, পা, গোড়ালি ফুলে যাওয়া
- মাথাব্যথা
- পেটের সমস্যা, পেটে ব্যথা
- ঝিমুনি বা মাথায় হালকা ভাব
- আচ্ছন্নতা
- খুব ক্লান্তি বোধ
- গরম ভাব লাগা

কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গুরুতর হতে পারে

- অল্প সময় ছাড়া ছাড়া বা তীব্র বুকে ব্যথা
- বুক ধড়ফড় বা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন
- মূর্ছা

এসবের কোনোটা হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকুন।

ওষুধ কীভাবে রাখতে হবে?

বেশি গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় রাখবেন না। একটা কৌটোয় বন্ধ করে রাখলে ভালো।

ওষুধের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে যে উপসর্গগুলো হয়

- ঝিমুনি
- মূর্ছা
- বুক ধড়ফড় করা।

আরও জানার কথা

ডাক্তার যেমন দেখাতে বলবেন দেখাতে হবে। নিয়মিত আপনার রক্তচাপ মাপা দরকার। মাঝে মধ্যে রক্ত পরীক্ষারও দরকার হতে পারে। আর কাউকে আপনার ওষুধ খেতে দেবেন না, তাঁর বিপদ হতে পারে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

● স্বাস্থ্যের বৃত্তে: চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে
চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ

সম্পাদকের প্রতি

ডা. শ্যামল ব্যানার্জী একজন অনুচ্চারিত চিকিৎসকের নাম

প্রিয় সম্পাদক,

স্বাস্থ্যের বৃত্তে জুন-জুলাই ২০১৫ সংখ্যায় 'ডা. শ্যামল ব্যানার্জী-একজন অনুচ্চারিত চিকিৎসকের নাম' প্রতিবেদনটির পরিপ্রেক্ষিতে একজন বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান গবেষক এবং প্রাণী বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমার এই পত্রের অবতারণা।

প্রতিবেদনে ওই জলাতঙ্ক রোগে ২০০০০-এর বেশি মানুষ মারা যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে সারা পৃথিবীতে ২০১৪-১৫ বর্ষে ২০, ৫৬৫ জন মানুষ মারা যায়। (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যসূত্র অনুসারে)। ভারতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৭৪০৪ জন। জলাতঙ্কে মৃত্যুর বড়ো কারণ হিসাবে কালো জাদুর (Black Magic) উপর বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। এই তথ্য সঠিক নয়।

জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর জন্য যা যা করা দরকার—

ক. রাস্তার কুকুরকে মেরে ফেলা, সমস্ত গৃহপালিত কুকুর ও বিড়ালকে প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কুকুরের সংখ্যা হ্রাস করা, সমস্ত গৃহপালিত কুকুরকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে এবং প্রতিষেধক দিতে হবে। যেসব গৃহপালিত বিড়াল ও কুকুরকে অন্য পাগলা জন্তু কামড়েছে তাদেরকে ধ্বংস করা। গৃহপালিত জন্তুদের জন্য উপযুক্ত প্রতিষেধক ও এই রোগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করা।

খ. স্বাস্থ্য দপ্তরের এক রিপোর্টে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিহত করার জন্য বলা হয়েছে— (১) স্বাস্থ্যশিক্ষা, (২) কুকুর ও অন্যান্য পশুর বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তি এবং পোষা কুকুরের বাধ্যতামূলক প্রতিষেধক নেওয়ার ব্যবস্থা করা। (৩) প্রতিষেধক না নেওয়া এবং রাস্তার কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা। (৪) পরীক্ষাগারে রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার প্রচলন করা।

গ. জলাতঙ্ক প্রতিরোধে প্রয়োজন কুকুর কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিষেধক নেওয়া। অবশ্যই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো উচিত যাতে মানুষ ওঝা বা গুণিনের কাছে না যায়। হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক সরবরাহ রাখতে হবে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক রাখতে হবে। তাপমারা হেরফের হলে ভ্যাকসিনের মান নষ্ট হয়ে যায়।

ঘ. জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক চিকিৎসা হল জলাতঙ্ক রোগ বিরোধী ভ্যাকসিন দিয়ে রোগীর শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা। এই রোগে প্রান্তবর্তী স্নায়ু (Peripheral Nerve) আক্রান্ত হয়ে তার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় স্নায়ু আক্রান্ত হয়। যত শীঘ্র প্রান্তবর্তী স্নায়ুতে ভাইরাস জমতে না পারে, তারজন্য শরীরে দ্রুত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রতিরোধ ব্যবস্থার পদ্ধতিকে বলা হয় অনাক্রম্যতা বা Immunity। জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, একমাত্র অ্যান্টি র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন-এর সাহায্যে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধে অ্যান্টি র‍্যাবিজ সিরামের (Anti Rabies Serum) ব্যবহার চিকিৎসাজগতে নবতম সংযোজন, ভ্যাকসিনের সঙ্গে যুক্তভাবে চিকিৎসা করলে সব থেকে ভালো হয়। ভ্যাকসিন ও সিরাম যুক্তভাবে চিকিৎসা করলে জলাতঙ্ক হবার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। সিরাম দিয়ে চিকিৎসা করলে খুব তাড়াতাড়ি অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে। আক্রান্ত স্থান বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে না। রোগটি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে জুন-জুলাই ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে মানিকবাবু জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে চিকিৎসকগণের ধারণা। ১৯৬০ সালের ঘটনাটি ডা. ব্যানার্জী ভেবেচিন্তেই জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা শুরু করেন। আমরা ধরে নিতে পারি ডা. ব্যানার্জীর চিকিৎসার ফলেই মানিকবাবু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ডা. ব্যানার্জীর চিকিৎসা শুরুর আগে মানিকবাবুর শরীরে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে কতদিন বাদে তা উল্লেখ নেই। প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে কামড়ানোর ২১ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তবে সবচেয়ে কম ৪ দিনের মধ্যে যেমন জলাতঙ্ক হওয়ার নজির আছে, তেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১ বছর পর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুকুরের রক্তে যদি র‍্যাবিজ ভাইরাস থাকে। তবেই জলাতঙ্ক রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে, যেহেতু এই রোগটি ১০০ শতাংশ মারণ রোগ, তাই ভ্যাকসিন দেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি।

গিনেসবুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস, ১৯৭৪ সালের রিপোর্টে জানা যায় ১৯৬৯ সালে ব্রাজিলে ৫১৫ জন আক্রান্ত রোগীর কাউকেই বাঁচানো যায়নি। একমাত্র ২৫ বছর বয়সি ১ মহিলা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে গেছেন। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের এই ঘটনা।

প্রতিবেদক আক্ষেপের সুরে প্রশ্ন করেছেন ডা. ব্যানার্জীর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ধরে আর একটু ভাবনাচিন্তা করা যায় না?

১৯৬০ সালের পর আজ ২০১৫ সালে জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি হয়েছে। যা আমাদের বিজ্ঞান কর্মীদের জানা দরকার।

১. সেল কালচার ভ্যাকসিন: স্নায়বিক কলা ভ্যাকসিন ও এমব্রিও ভ্যাকসিনে নানা ক্ষতিকারক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়। হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল স্ট্রেন ভ্যাকসিন (HCDV) অত্যন্ত উন্নতমানের একটি ভ্যাকসিন। চিকিৎসক, প্রাণীবিদ যাঁরা জীবজন্তু নিয়ে কাজ করেন এবং জলাতঙ্ক রোগীর সেবা বা চিকিৎসা করেন বা যাঁরা র‍্যাবিজ ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।

যদি দংশন পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন দিতে হয় তবে প্রথম ইঞ্জেকশন এবং ১ মাস পর আর ১টি ইঞ্জেকশন মোট ২টি ইঞ্জেকশন। এরপর শতকরা একশো ভাগ অ্যান্টিবডি প্রস্তুত হয়ে যায়। ১ বছর পর একটি বুস্টার

ইঞ্জেকশন নিতে হয়। দীর্ঘ প্রায় ২০-২৫ বছরের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়।

দংশন পরবর্তী চিকিৎসা ১ম, ৩য়, ৭ম ও চতুর্দশ দিনে মোট ৪টি প্রাথমিক ইঞ্জেকশন নিতে হয়। ৩০ দিন ও ৯০ দিনের মাথায় ২টি বুস্টার ইঞ্জেকশন নিতে হয়। অর্থাৎ মোট ৬টি। মনে রাখতে হবে—

আগে প্রাথমিক চিকিৎসা অবশ্যই করতে হবে। ক্ষতস্থান সাবান দিয়ে ধুয়ে ৬০-৭০ শতাংশ অ্যালকোহল বা আয়োডিন সলিউশন লাগাতে হবে।

এই ভ্যাকসিনের সাধারণত কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না।

সামান্য জ্বর হতে পারে এবং তা ২/১ দিনের মধ্যে কমে যাবে। মনে রাখা দরকার এই ভ্যাকসিন ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে।

জলাতঙ্করোগের ক্ষেত্রে রেসাস ডিপ্লয়েড সেল স্ট্রেন র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন [Rhesus Diploid Cell Strain Rabies Vaccine (RDRV)] একটি অত্যন্ত কার্যকরী ভ্যাকসিন—HCDV-এর মতো কার্যকরী, অথচ দামে কম।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সহায়তায় পাস্তুর ইনস্টিটিউট, কুনুর, বানরের কিডনির কোষ থেকে vero cell tissue culture vaccine প্রস্তুত করার কাজ চলছে।

কলকাতার বেলগাছিয়া পঃবঙ্গ মৎস ও প্রাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাবিজ নিয়ে গবেষণা কাজ চলছে।

এ ছাড়া পিউরিফায়েড চিক্ এমব্রিয়ো সেল র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন 'Rabipur' বাণিজ্যিক নামে দংশন-পূর্ব ও দংশনপরবর্তী ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন বাজারে চালু আছে। বাহুর মাংসপেশির মধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। দংশন-পূর্বে প্রতিরোধে পশু চিকিৎসক ও ল্যাবরেটরির কর্মী ব্যক্তিদের ০, ৭, ২১ তম দিনে মোট ৩টি ইঞ্জেকশন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। দংশন পরবর্তী চিকিৎসা দ্রুত শুরু করা দরকার। মোট ৬টি ইঞ্জেকশন, ০, ৩, ৭, ১৪, ৩০, ৯০ দিনে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ১ মিমি দ্রবণে দ্রবীভূত করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। যিনি জলাতঙ্ক রোগীর সেবা করবেন তাকে অবশ্যই ভ্যাকসিন নিতে হবে। রোগীকে খুব শান্তভাবে নির্জন ঘরে রাখা হয়, আলো কম থাকবে, ঠান্ডা বাতাস যাতে না লাগে। রোগীর সঙ্গে বেশি কথা বলা উচিত নয়।

প্রতিবেদনে কালো জাদুর বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অলৌকিক নিরাময় ও আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে একটি আইন রয়েছে নাম 'The Drug & Magic Remedies (objectionable advertisement) Act, 1954 ১৯৯৭ সালের ১১ নভেম্বর 'অলৌকিক নিরাময়'-এর বিরুদ্ধে বিজপুর (উ: ২৪ প:) থানায় বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে এফ আই আর করা হলে ১৮৮ নং তাং ১৩/১১/৯৭ ধারায় কেস শুরু হয়, চার্জশিট দেওয়া হয়। বারাকপুর মহকুমা আদালতে দীর্ঘদিন কেসের শুনানি হয়। মামলায় অলৌকিক নিরাময় অবৈজ্ঞানিক প্রচারকের শাস্তি হয়। আইনি লড়াইয়ে এটি বিজ্ঞান দরবারের ঐতিহাসিক জয়। ২০০৩ সালে শান্তিপুর থানায় ১২টি গণবিজ্ঞান সংগঠনের পক্ষ থেকে যৌথভাবে স্মারকলিপিসহ এফ আই আর করা হয় অলৌকিক প্রকাশনার বিরুদ্ধে (নদিয়ার চাঁদড়া, ফাতিমা ভবন কমিটির বিরুদ্ধে)। পরবর্তীকালে প্রচার আন্দোলনের ফলে অনেকটা সাফল্য পাওয়া যায়।

২০০২ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম বিজ্ঞান রাজ্য কংগ্রেসে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বনাম অলৌকিক বুজরুকি গবেষণাপত্র পাঠ করা হয়। গণবিজ্ঞান সমন্বয়কেন্দ্রের পক্ষে বর্তমান পত্র-প্রতিবেদক গবেষণাপত্রটি পেশ করেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে কালো জাদু তথা অলৌকিকতার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চলছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থাগুলির অলৌকিক নয় লৌকিক শিরোনামে প্রদর্শনী, পোস্টার পুস্তিকা প্রকাশ নিয়মিত কর্মসূচি।

খুব সম্প্রতি ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় কলকাতা জয়েন্ট কমিশনার অব পুলিশের কাছে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত কয়েকটি অবৈধ বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে এফ আই আর করেন। এরপরে পরেই বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে সম্পাদক সুরজিৎ দাস, বিজপুর থানায় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত (৩০/৭/১৪, ১৩/৮/১৪, ৬/৮/১৪, ২০/৮/১৪ বিজ্ঞাপনগুলিকে নিষিদ্ধ করার জন্য দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেন। (''চুর্নী হার্টের রোগ প্রতিরোধক'' ''লিভারের রোগ বড়ো বালাই পাখরাজ হতে পারে তার এক দাবাই।'' প্রতিটি বিজ্ঞাপনই আইন বিরোধী।)

কালো জাদু তথা অলৌকিকতার বিরুদ্ধে লড়াইটা আসলে দীর্ঘমেয়াদি লড়াই এবং পাশাপাশি এটা একটা রাষ্ট্রবিরোধী লড়াইও বটে।

ধন্যবাদসহ

জয়দেব দে

বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া।

● চিকিৎসা ব্যক্তির অধিকার, সমষ্টির দায়িত্ব

পুস্তক পর্যালোচনা

যখন পৃথিবী বিপন্ন (এক পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন)

প্রকাশক জয়দেব দে (বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা), পরিবেশক: বুকমার্ক, কলকাতা ৭৩, মূল্য: ৬০ টাকা

ডা. জয়ন্ত দাস

পৃথিবীর উষ্ণায়নের কথা আজ স্কুলের বাচ্চারাও জানে। আজ সবাই যেন ভয়ে ভয়ে থাকে, পৃথিবীটা থাকবে তো? এই দেশ বাঁচবে তো? কিন্তু কীভাবে কারা এই ধ্বংস ডেকে আনছে? কেন বিশ্বের সম্ভাব্য ধ্বংসের কথা জেনেও সেটা নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা তেমন চিন্তিত নন? কীভাবে কিছু আপাত সুবিধা ভবিষ্যৎকে শেষ করে দিচ্ছে সে কথা কেউ বোঝেন না, তা তো নয়।

তবে কি আমাদের জানাবোঝায় কোনো খামতি আছে? মনে হয়, আছে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ ও তার বিপদ সভ্যতার একটা বিশেষ ধরন, উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও মালিকানার একটা বিশেষ সম্পর্ক থেকে উপজাত। এই কথাটা পরিবেশ নিয়ে আলোচনার সময় স্পষ্ট করে বলতে অনেকেই তেমন রাজি হন না। ভাবখানা পরিবেশ নিয়ে চড়ুই পাখি নিয়ে জলাশয় নিয়ে মোটরগাড়ির ধোঁয়া নিয়ে কথা বলার সময় খামোকা কে মালিক কে শ্রমিক এসব কেন বলতে যাব? পৃথিবী মরলে যে সব্বাই মরবে। পরিবেশ হল মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি, আর তাই সেটার বিপদ নিয়ে হল সবার বিপদ।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে ঠিক বলেই মনে হয়। কিন্তু সব আপাত-ঠিক তো আর সত্যি-ঠিক নয়। তাই বিষয়গুলো খুঁটিয়ে দেখতে হয়। দেখতে হয়, বিশ্ব-উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসগুলোর নিঃসরণ কোথা থেকে হচ্ছে, সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো অন্যভাবে চালানো যেত কিনা। দেখতে হয়, কেন এ দেশে সৌরশক্তি অঢেল থাকা সত্ত্বেও আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করা সে দেশে বাতিল প্রযুক্তির পরমাণু-চুল্লি কিনতে হচ্ছে, আর ফুকুশিমার দুর্ঘটনার পর যেখানে সব উন্নত দেশেই পরমাণু-চুল্লি বাতিল করছে, আমাদের মন্ত্রী-আমলা মায় বিজ্ঞানীরা কেন এ দেশে পরমাণু-শক্তির বিকল্প নেই বলে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করতে ব্যগ্র।

পরমাণু শক্তি তো বড়ো ব্যাপার। আমাদের সর্বনাশ হয়েছে ও হচ্ছে আরও অনেক আপাত-তুচ্ছ, আপাত-প্রগতি, আপাত-উন্নয়নের হাত ধরে। নদী-পুকুরের পানীয় জলে জীবাণু-দূষণের কথা আমাদের বোঝানো হল, আর আমরা, এই সুজলা সুফলা নদীমাতৃক বাংলার অজস্র জলসম্পদের অধিকারী বঙ্গবাসীরা, শুরু করলাম ভূ-জল উত্তোলন। সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে এল আর্সেনিক মহামারী, চাষ হয়ে উঠল কীটনাশক রাসায়নিক সার নির্ভর ও জল অপচয়কারী। কমল চাষির আত্মনির্ভরতা, কমল অমূল্য ভূ-জল সঞ্চয়, চাষের খরচ বাড়ল, বাড়ল ভূমিক্ষয়, বাড়ল কৃষিতে কর্পোরেট -নিয়ন্ত্রণ। বায়ুদূষণ কমানোর উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি হল, কিন্তু সব থেকে বেশি দূষণকারী দেশ আমেরিকা তার নিজের চাল বজায় রাখল। আমাদের দেশে বড়ো শিল্পের স্বার্থে নির্বিচারে গাছ কাটা চলল, কারখানার চিমনির ধোঁয়া আরও বেশি কালো হয়ে উঠল। ভোপালে রাসায়নিক গ্যাসে লক্ষ মানুষকে মারল যারা, তাদের কোনো সাজা হল না। আর স্কুল-কলেজে পরিবেশ-বিজ্ঞান বইতে বলা হতে লাগল যেন আমাদের দেশের বায়ু-দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন আর পরিবেশ রক্ষা আইন করেই আমরা বিপদমুক্ত হয়েছি। তা যে হইনি সেটা বোঝার জন্য এ দেশে বিপন্ন প্রজাতির ক্রমবর্ধমান তালিকার দিকে একবার চোখ বোলানোই যথেষ্ট। একবার যেন মনে হল কিছু কাজ হচ্ছে অন্তত শব্দদূষণের ক্ষেত্রে, পুজোর শব্দতাণ্ডব যেন কমল কিছুটা, কিন্তু প্লাস্টিক নিয়ে সরকারি কিছু হইচই-এর মতোই সে আশা কিছুদিন পরে শূন্যগর্ভ প্রমাণিত হল। আধুনিকতার নতুন সমস্যা ই-বর্জ্য বা মোবাইল-দূষণ নিয়ে কোনো ভাবনা সরকারি (এমনকী বেসরকারি) মহলে শোনা যায় না। বিকল্প শক্তির অজস্র সম্ভাবনা তাত্ত্বিক স্তরেই রয়ে যাচ্ছে।

কথাগুলো খুঁটিয়ে দেখার, দেখানোর বড়ো দরকার। পথ কোনদিকে সেটা বলার, সেটা নিয়ে তর্ক তোলার, একটা লাগাতার প্রচেষ্টা দরকার। কাঁচড়াপাড়ার 'বিজ্ঞান দরবার' এই কাজটা বহুদিন যাবৎ ধারাবাহিকভাবে করে চলেছে। তাঁদেরই এক প্রচেষ্টা হল এই বইটি। পড়া দরকার, কেননা শেষ বিচারে, আমরা তেমন পৃথিবীই পাব যেমন পৃথিবীর জন্য আমরা প্রস্তুত। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. জয়ন্ত দাস, এম ডি, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক।

● স্বাস্থ্যের বৃত্তে: চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ

শব্দ ছক

প্রস্তুতি—রুচিরা মজুমদার

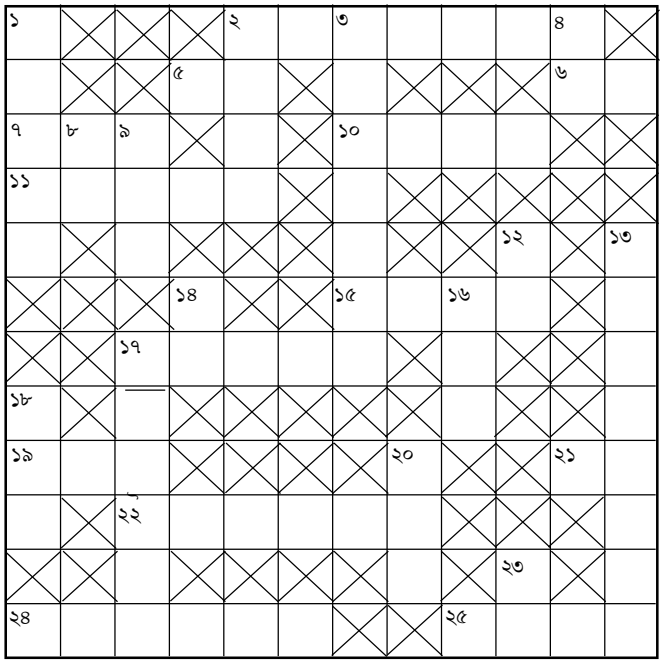

সূত্র:

পাশাপাশি: ২। এই পরীক্ষা রোগীকে প্রায়ই করাতে হয়। ৫। জীব ৬। বাচ্চাদের দাঁতের ক্ষতি করে। ৭। চোখের অসুখ। ১০। চামড়ার শুষ্কতা দূর করে। ১১। জন্ডিস হলে এটা মাপা হয়। ১৫। মানসিক এক জটিলতা যে গ্রিক রাজার নামে। ১৭। এক ধরনের মানসিক রোগী। ১৯। এক ভাইরাসঘটিত অসুখের নাম। ২১। জলাতঙ্ক রোগ এর মাধ্যমে ছড়ায়। ২২। অনিদ্রা রোগ। ২৪। ওষুধের খারাপ দিক। ২৫। এক ধরনের জ্বর।

উপরনীচ: ১। এটা কমে গেলে আয়রন খেতে হয়। ২। এর অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। ৩। লিপিড প্রোফাইলে এর দেখা পাবেন। ৪। ব্যায়াম করলে থাকতে পারবেন। ৮। এটা প্রায় প্রস্রাব-সংক্রমণের জীবাণুর চালু পরিভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৯। মশা দেখলেই— ১২। যতক্ষণ এটা আছে ততক্ষণ আশা ছাড়তে নেই। ১৩। মস্তিষ্কের প্রদাহ। ১৪। থার্মোমিটারে থাকে। ১৬। কবজি টিপে ডাক্তাররা এটা দেখেন। ১৭। অঙ্গ নাড়াতে পারছে না যে রোগী। ১৮। উকুন হলে, চুলের সঙ্গে এটাও পরিষ্কার রাখুন। ২০। হাতুড়ে। ২৩। ঘুম পেলে বা 'বোর' হলে ওঠে।

সমাধান ৩৭ পাতায়।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকার কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি